বালির ভিতের উপর কি দাঁড়িয়ে আছে

ড. সুরেন্দ্র কুমার শর্মা 'অজ্ঞাত'

বালির ভিতের উপর কি দাঁড়িয়ে আছে হিন্দু ধর্ম?

ড. সুরেন্দ্র কুমার শর্মা ‘অজ্ঞাত’

অনুবাদঃ শুদ্ধবুদ্ধি
প্রচ্ছদঃ জাহিদ হাসান
১ম সংস্করণঃ ২৫/০১/২০২১

অনুবাদকের উৎসর্গ
আমার স্নেহময়ী মায়ের প্রতি

সূচিপত্র

বইটি ইন্টারেক্টিভ। সূচিপত্রে উল্লেখিত কোনো শিরোনামে টাচ বা ক্লিক করলেই কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছে যাওয়া যাবে। প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপরে বাম পাশে ^ চিহ্ন আছে, এতে টাচ বা ক্লিক করলে সূচিপত্রে ফিরে আসা যাবে।

উপক্রমণিকা

লেখকের কথা

'क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिन्दू धर्म?'[১] নামক মূল পুস্তকটি লিখেছেন ড. সুরেন্দ্র কুমার শর্মা 'অজ্ঞাত'। লেখকের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা একটি প্রথাবদ্ধ হিন্দু পরিবারে। তার পিতা ছিলেন পণ্ডিত অমরনাথ শাস্ত্রী। তিনি পাঞ্জাবের সনাতন ধর্ম প্রতিনিধি সভার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি আর্য সমাজিদের সাথে নানা সময় শাস্ত্রার্থ করেছেন। তার কাছে পরাজিত হয়ে ১৯৩৬ সালে পাঞ্জাবের ফতহগড় চুড়িয়ার বিখ্যাত আর্য সমাজি বিদ্বান 'মনসারাম' আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর বিখ্যাত পুস্তক সত্যার্থ প্রকাশককে মঞ্চের মধ্যেই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। লেখক সুরেন্দ্র কুমার শর্মা ১৯৭১ সালে গুরু নানক দেব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে M.A. পাশ করেন। M.A. তে তিনি তার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এর ফলে গুরু নানক দেব বিশ্ববিদ্যালয় তাকে স্বর্ণ পদক দ্বারা সম্মানিত করে। এরপর তিনি টেক্সাসের মিনেসোটা ইন্সটিটিউট অফ ফিলোসফি থেকে সংস্কৃতে পিএইচডি করেন। এছাড়াও তিনি হিন্দি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। বর্তমানে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের একজন অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন।

লেখকের পিতা মনে করতেন যা কিছু পুরাতন, সনাতন তার সবই ভালো। লেখকও প্রথম এই ধারণা নিয়েই এগিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে পড়াশোনা করতে করতে একসময় তিনি বুঝতে পারেন যে, যা কিছু পুরাতন, সনাতন তার সবই ভালো হয় না। প্রাচীন শাস্ত্রে এমন অনেক কিছু লেখা আছে যা বর্তমান মানবতার যুগে সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না।

তিনি চান না মানুষ চোখ বুঝে ধর্মগ্রন্থকে মানুক। তিনি চান মানুষ তার নিজের বিবেকবুদ্ধির সম্যক ব্যবহার করে তার জীবনকে পরিচালিত করুক। তাই তার অভিপ্রায় হল হিন্দু সমাজ অন্ধশ্রদ্ধার বদলে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনাকে ধারণ করুক। তিনি হিন্দু সমাজের কল্যাণ কামনা করেন। তাই তিনি হিন্দু সমাজ থেকে জাতপাত, ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা ও বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করতে চান। জরাজীর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথার অবসান ঘটিয়ে তিনি হিন্দুসমাজকে মানবতা, বিজ্ঞান মনস্কতা, ধর্মনিরপেক্ষতার বার্তা পৌঁছে দিতে চান। তাই তিনি হিন্দু সমাজের সংস্কারে বিশেষভাবে আগ্রহী। তিনি ছদ্ম হিন্দুত্ব এবং প্রকৃত হিন্দুত্বের মধ্যে স্পষ্ট বিভেদরেখা এঁকে দিয়ে বলেছেন, "আমাদের যথার্থ হিন্দুত্ব এবং ছদ্ম হিন্দুত্বের মধ্যে তফাৎটা বুঝতে শিখতে হবে, কেননা ছদ্ম হিন্দুত্ব হিন্দুত্বের শত্রুদের

১ বাংলা উচ্চারণঃ 'ক্যায়া বালু কি ভীত পর খড়া হৈ হিন্দু ধর্ম?' অর্থাৎ বালির ভিতের ভিতের উপর কি দাঁড়িয়ে আছে হিন্দু ধর্ম?

চাইতেও বেশি ক্ষতি করতে পারে হিন্দুত্বের। ছদ্ম হিন্দুত্ব কেবল চেঁচামেচি করতে পারে, আইন ব্যবস্থায় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে, সংখ্যালঘুদের অপবাদ দিতে পারে, কিন্তু তা বৌদ্ধিকভাবে এতটা সক্ষম নয় যে তা প্রকৃত হিন্দুত্বের নির্দেশিত সমস্যাগুলোকে বুঝতে পারে এবং তার সমাধানে প্রবৃত্ত হতে পারে। যথার্থ হিন্দুত্ব হিন্দু সমাজের প্রকৃত কল্যাণের কথা ভাবে, হিন্দুদের নিয়ে কেবলই রাজনীতি করে না। যদি হিন্দুসমাজ তার ত্রুটিগুলোকে প্রথমে চিহ্নিত করতে পারে, তবেই সেসব দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু যদি হিন্দুসমাজকে তার ত্রুটির প্রতি উদাসীন করে রেখে সংখ্যালঘুদের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টিতে নিয়োজিত করা হয়, তাহলে কিভাবে হিন্দুসমাজের মঙ্গল হতে পারে? এমনিতেই মানুষেরা তাদের দুর্বলতার প্রতি উদাসীন থাকে, এরপর যদি তাদের আরো উদাসীন করে তোলার মত তথাকথিত হিতৈষী লোকেদের আবির্ভাব হয় তাহলে কিভাবে মানুষ সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারবে?

প্রকৃত হিন্দুত্ব আত্মসমালোচনার দৃঢ় ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে নিজের ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ এবং সমাজের পর্যালোচনা করতে জানে, আত্মসমালোচনা করতে জানে এবং ত্রুটি দূরীকরণের সকল প্রকার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। অপরপক্ষে, ছদ্ম হিন্দুত্ব কেবল চাটুকারীতা করে প্রলোভনমূলক কথায় হিন্দুদের ভুলিয়ে ভালিয়ে রাজনীতি করতে পারে অথবা রাজনীতি করার স্বার্থে হিন্দুদের মনে সংখ্যালঘুদের প্রতি বিষ ঢেলে দিতে পারে। যেসব হিন্দুরা হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী ছদ্ম হিন্দুদের সংস্পর্শে আসে, তাদের হিন্দু সমাজের কল্যাণ করার কোনো সামর্থ্য অবশিষ্ট থাকে না।”

বাল্মীকি তার রামায়ণে বলেছেন, প্রিয় কথা বলার লোকের কোনো অভাব হয় না। অপ্রিয় কিন্তু উপকারী সত্য কথা বলতে পারেন এমন লোক বড়োই দুর্লভঃ

সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততম্ প্রিয় বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।।
-রামায়ণ/যুদ্ধকাণ্ড/১৬/২১

হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো ঠিক কোথায় তা লেখক ভালোভাবেই জানেন এবং তিনি সকলকে এ ব্যাপারে অবহিত করতে চান। তিনি চান হিন্দুসমাজেরই কেউ হিন্দুসমাজের ত্রুটিগুলোকে তুলে ধরুক। যদি ত্রুটিগুলোকে আড়াল করে কেবল প্রাচীন মহিমার প্রচার করা হয়, তাহলে একসময় না একসময় হিন্দুরা অন্যদের কাছ থেকে তাদের ত্রুটির কথা জানতে পারবে, এর ফলে তারা লজ্জিত হবে, পথভ্রষ্ট হবে।

লেখক বলেন, “কোনো সভ্যতাই পুরোপুরি ঠিক হয় না, ভুলও হয় না। একমাত্র ভবিষ্যতই নির্ণয় করতে পারে, অতীতের কোন কাজটি সঠিক ছিল, কোনটি ভুল ছিল।

প্রাচীনদের সকল কর্মকে আমরা যদি চোখবুজে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি তাহলে তা তাদের প্রতিও অন্যায় আচরণ হবে। কেননা তারা নিজেরাই স্বীকার করেছিলেনঃ

যান্যয়নবদ্যানি কর্মাণি, তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি।
যান্যস্মাকং সুচরিতানি, তানি ত্বয়োপাস্যানি, নো ইতরাণি।
- তৈত্তিরীয় উপনিষদ **১/১১**

অর্থাৎ, আমাদের যেসকল কর্ম নির্দোষ, তোমাদের সেইসব কর্মের অনুসরণ করা উচিত, অন্যগুলোর নয়। আমাদের যেসব আচরণ সুন্দর, তোমাদের সেসবেরই আচরণ করা উচিত, অন্যগুলোর নয়।

অনুবাদকের কথা

ড. সুরেন্দ্র কুমার শর্মার লেখা 'क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिन्दू धर्म?' বইটি যখন আমি প্রথম দেখেছিলাম তখনই ভীষণ অবাক হয়েছিলাম এর বিষয়বস্তু এবং আলোচনার গভীরতা দেখে। বইটি নিঃসন্দেহে ভীষণ তথ্যবহুল। এমন বই ভারতবর্ষে অত্যন্ত বিরল। বাংলা ভাষাতে এমন অসাধারণ গ্রন্থ এখনো আমার চোখে পড়েনি। তাই প্রথম দেখাতেই এই বইটিকে বাংলায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিই এবং কয়েকদিনের মাথাতেই এর অনুবাদ করতে শুরু করি। মূল গ্রন্থটি সুবিশাল কিন্তু বর্তমান ইবইতে কেবলমাত্র ৪ টি প্রবন্ধের অনুবাদের সঙ্কলন করা হচ্ছে। তাই যাদের আগ্রহ আছে তাদের অবশ্যই মূল গ্রন্থটি পড়ে দেখতে আমি অনুরোধ করবো। মূল গ্রন্থটি পড়ে পাঠকেরা যে বিলক্ষণ বিস্মিত হবেন এতে সন্দেহ নেই। হিন্দি ভাষায় মূল গ্রন্থটির প্রকাশ করেছে विश्व बुक्स[১]।

এবার নিজের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাইবো। আমি অর্থাৎ এই গ্রন্থের অনুবাদকের পরিচয় ঠিক কি? এই গ্রন্থের কোথাও আমার নিজের নাম ব্যবহার করা হয়নি, কেবল ছদ্মনাম 'শুদ্ধবুদ্ধি' ব্যবহৃত হয়েছে। আমি 'অজিত কেশকম্বলী II' ছদ্মনাম নিয়ে বেশ কিছু বছর ধরে বেশ কিছু ব্লগে লেখালেখি করছি। আমাকে অনেকে এই নামেই চেনেন কিন্তু সম্প্রতি এই ছদ্মনাম পরিবর্তন করে 'শুদ্ধবুদ্ধি' নামটি গ্রহণ করেছি।

এই গ্রন্থের সম্পর্কে কয়েকটি কথা আমি বলতে চাইবো। গ্রন্থটি পড়লে বুঝতে পারবেন প্রাচীন হিন্দুসমাজে বহুল প্রচলিত পশুবলি, গরুবলি, নরবলি, মাংসভক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কুসংস্কার এবং ধর্মীয় গালগল্পও এতে আলোচিত হয়েছে। অনেকে মনে করতে পারেন, হিন্দু ধর্মকে ছোটো করার উদ্দেশ্যে এই ইবইটি তৈরি করা হয়েছে কিন্তু হিন্দু ধর্মকে অপমান করার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই। ধর্ম, সমাজ এবং মানুষের মাঝে ভালো-খারাপ দুটি দিকই থাকে। সামগ্রিক

১ বিশ্ব বুকস

মূল্যায়ণের জন্য ভালো-খারাপ উভয় দিক জানারই প্রয়োজন হয়। কিন্তু যারা অন্ধ ধর্মানুসারী তারা ধর্মের মন্দ দিকটিকে আড়াল করে সবসময় তার মাহাত্ম্যের প্রচার করে থাকে। অর্ধ সত্য মিথ্যারই সামিল। তাই ধর্মের তিক্ত কিন্তু সত্য রূপটিকে সবার সামনে নিয়ে আসা আমার লক্ষ্য; এই গ্রন্থের মূল লেখকের লক্ষ্যও ঠিক তাই। এই লক্ষ্যেই এই গ্রন্থের কিছু প্রবন্ধের অনুবাদ করা হল।

এই গ্রন্থে পশুহত্যা এবং গোমাংস ভক্ষণ প্রসঙ্গে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অনুবাদক হিসাবে পশুহত্যা এবং গোমাংসভক্ষণ প্রভৃতিকে সমর্থন করে আমি অনুবাদের কাজ করিনি অর্থাৎ হিন্দুদের পশুহত্যা করা উচিত বা গোমাংস ভক্ষণ করা উচিত এই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা আমি করছি না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের বিচার, বুদ্ধি, বিবেকের মাধ্যমেই স্থির করবেন, তিনি কি খাবেন এবং কেন খাবেন। এই বিষয়ে আমি বিশেষ কোনো নির্দেশনা দিতে আগ্রহী নই। এছাড়া অশ্বমেধ যজ্ঞে যে কাণ্ড হত তা অনেকের কাছে ভীষণ অশ্লীল ও গর্হিত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে লেখার কারণে লেখককে এবং অনুবাদ করার কারণে অনুবাদককে অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে না। অশ্লীলতার অভিযোগ যদি করতেই হয় তাহলে যারা এসব রীতিনীতির প্রচলন করেছিল এবং যারা এসবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে, পালন করেছে তাদের প্রতিই অশ্লীলতার অভিযোগ করা উচিত হবে।

হিন্দু ধর্মে একসময় পশুহত্যা এবং গোহত্যা প্রভৃতি যে প্রচলিত ছিল, অশ্বমেধে যে উদ্ভট রীতিনীতি পালিত হত তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। এই সত্যের প্রচারের আকাঙ্ক্ষাতেই আমি এই প্রবন্ধগুলোর প্রচারে আগ্রহী হয়েছি। সত্য কঠিন হলেও সেই কঠিনকে আমি ভালোবাসতে শিখেছি। এই গ্রন্থটি যদি কাউকে এই ঐতিহাসিক সত্যগুলোর দিকে আকৃষ্ট করে তবেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করবো।

রক্তস্নাত পৃষ্ঠা

ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে অনেক সম্পদায় আছে যারা মাংস ভক্ষণকে গর্হিত বলে মনে করে। তারা মনে করে তাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের কোথাও মাংস ভক্ষণের কথা নেই, পবিত্র শাস্ত্রের সর্বত্রই মাংস ভক্ষণ পাপ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু যদি নিরপেক্ষভাবে হিন্দু শাস্ত্র তথা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অধ্যয়ণ করা হয়, তাহলে অনেক আশ্চর্যজনক এবং বিভৎস তথ্য জানা যাবে যেমনঃ গোহত্যা, গোমাংস ভক্ষণ, চর্বি দিয়ে হবন, আলাদা আলাদা প্রাণীর মাংসে দেবতা এবং পিতৃগণের তৃপ্তির ভিন্ন ভিন্ন সময়কাল নির্ধারণ, ঋষিমুনিদের কুকুর প্রভৃতির মাংসভক্ষণ ইত্যাদি।

শুনঃশেপের গল্প

বেদ যেহেতু হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ তাই প্রথমে বেদের পর্যালোচনা করাই উচিত হবে। ঋগ্বেদে (১/২৪/১২-১৫) শুনঃশেপ নামে এক ব্যক্তির বর্ণনা রয়েছে, যাকে নরমেধ যজ্ঞে বলি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। মহাভারত (অনুশাসন পর্ব ৩/৬) থেকে জানা যায় যে তিনি ঋচীক ওরফে অজীগর্তের পুত্র ছিলেন। তাকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য আনা হয়েছিল।

'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামে মনুস্মৃতির একটি প্রাচীন ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে। এই গ্রন্থে মনুস্মৃতি (১০/১০৫) এর ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে শুনঃশেপকে স্বয়ং তার পিতা অজীগর্ত যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য হরিশ্চন্দ্রের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। অজীগর্ত ১০০ গরুর বদলে নিজ হাতে শুনঃশেপকে যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। পিতা-পুত্রের মধ্যকার সম্পর্কের এমন দৃষ্টান্ত দেওয়া কি আমাদের 'পূজনীয়' ধর্মগ্রন্থগুলোর উচিত হয়েছিল? এসব গ্রন্থ না পড়েই অধিকাংশ হিন্দুরা এদের গুণকীর্তনে ক্লান্ত হয় না।

ঋগবেদের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' এ এই ঘটনা এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে এখান থেকে অনেক নতুন তথ্য জানা যায়। এই গ্রন্থে (সপ্তম পঞ্চিকা, অধ্যায় ৩) লেখা আছে যে রাজা হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। এজন্য তিনি বরুণের উপাসনা করেছিলেন। বরুণ প্রসন্ন হয়ে বর দিয়েছিলেন, "তোমার সন্তান অবশ্যই হবে। কিন্তু সেই সন্তানকে আমার জন্য বলি দিতে হবে।"

বরুণের কৃপায় রাজা হরিশ্চন্দ্র রোহিত নামের বালককে জন্ম দিতে সক্ষম হলেন। কিন্তু তিনি তার পুত্র রোহিতকে বরুণের কাছে বলি দিতে চাইছিলেন না, বলির ব্যাপারটি

তিনি সবসময় এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। এর ফলে হরিশ্চন্দ্র রোগগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তাই রাজা হরিশ্চন্দ্র অজীগর্ত ঋষির পুত্র শুনঃশেপকে ক্রয় করে তাকে বরুণের যজ্ঞে বলি দেবেন বলে স্থির করেন। যজ্ঞ আরম্ভ হল। কিন্তু বরুণের স্তুতি করে শুনঃশেপ মুক্তি পেয়ে গেলেন (অন্যথায় তার কাবাব বানিয়ে দেওয়া হত) আর হরিশ্চন্দ্রও নিরোগ হলেন। শুনঃশেপ তার লোভী পিতাকে ত্যাগ করলেন এবং বিশ্বামিত্র তাকে পুত্র হিসাবে স্বীকার করলেন।[১] এই কাহিনীটি একই রূপে 'শাঙ্খায়ণব্রাহ্মণ' (১৫/১৭) এবং ব্রহ্মপুরাণে (অধ্যায় ১০৪) পাওয়া যায়। এমন কাহিনীগুলোই কি মানুষকে দিয়ে যুগের পর যুগ ধরে বীভৎস নরসংহার করাচ্ছে না?

গোহত্যা

ঋগ্বেদে (১০/৮৬/১৪) ইন্দ্রদেব বলছেনঃ

উক্ষো হি মে পঞ্চদশ সাকং পচন্তি বিংশতিম্।
উতাহমদ্মি পীব ইদুভা কুক্ষী পৃণন্তি মে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ।।

অর্থাৎ আমার জন্য ইন্দ্রাণী প্রেরিত যজ্ঞকর্তারা ১৫-২০ টি বৃষ হত্যা করে রান্না করে, যা খেয়ে আমি স্থূল হই। তারা আমার উদরকে সোম দ্বারাও পূর্ণ করে।

ঋগ্বেদ (১০/৮৯/১৪) থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে গোহত্যা এতই সামান্য ব্যাপার ছিল যে কথাবার্তার সময় উপমা হিসেবে তার প্রয়োগ করা হত। দেখুনঃ

মিত্রক্রুবো যচ্ছসনে ন গাবঃ পৃথিব্যা আপৃগমুয়া শয়ন্তে।।

অর্থাৎ হে ইন্দ্র, যেমন গোহত্যা স্থানে গাভী কাটা হয়, তেমনি তোমার এই অস্ত্র দ্বারা মিত্রদ্বেষী রাক্ষসেরা কর্তিত হয়ে পৃথিবীতে সবসময়ের জন্য শয়ন করুক।

ঋগ্বেদে (৫/২৯/৭, ৮/১২/৮ এবং ৮/৬৬/১০) দেবতাদের মহিষ ভক্ষণের অনেক বিবরণ রয়েছে। আলোচনায় আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে এই সংকেত দেওয়া উচিত হবে যে আর্যরা নিজেদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করতো বা যা যজ্ঞে ব্যবহার করতো, তা তারা নিজেরাও ভক্ষণ করতো, কেননা যজ্ঞে স্বাহা হওয়ার পর অবশিষ্ট পদার্থ খাওয়া পরমপূণ্য বলে বিবেচিত হত (গীতা ৩/১৩)। বাল্মীকি রামায়ণ থেকে জানা যায় যে মানুষেরা যা ভক্ষণ করে, তারা তেমন দেবতারই কল্পনা করে; মাংসভোজীরা মাংসভোজী দেবতাদের কল্পনা করে, আর নিরামিষভোজীরা নিরামিষভোজী দেবতাদের

---

১ বৈদিক সাহিত্য, পৃষ্ঠা ১৮৩-১৮৪

কল্পনা করে।

যজুর্বেদে (২১/৪৩) আছে, "অশ্বিনীকুমারদের জন্য ছাগলের তাজা চর্বি দিয়ে যজ্ঞ করা উচিত।"[১] এবং "এই সংসারে অনেক পশু সহযোগে হোম করে হুতশেষ ভক্ষণ করা[২], বেদবিদ... মনুষ্যরা, প্রশংসা লাভ করে।" (যজুর্বেদ ১৯/২০, স্বামী দয়ানন্দকৃত ভাষ্য)

এখানে বেদের আধুনিক মহাপণ্ডিত দয়ানন্দের প্রসিদ্ধ পুস্তক 'সত্যার্থ প্রকাশ' এর ১৮৭৫ এর সংস্করণ থেকে একটি উদাহরণ দিলে তা অসঙ্গত হবে না। উক্ত পুস্তকে আছে, "যেখানে গোমেধ যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, সেখানে পুরুষ পশুদের হত্যা করার কথা বলা হয়েছে, কেননা বৃষ প্রভৃতি যেমন পুষ্ট হয়ে থাকে, গাভী প্রভৃতি তেমন পুষ্ট হয় না। যেসব গাভী বন্ধ্যা তাদেরও গোমেধ যজ্ঞে হত্যা করার কথা লেখা আছে।[৩]

যজুর্বেদে (৩১/৯) 'পুরুষমেধ' যজ্ঞের[৪] বিবরণ পাওয়া যায় – ভূতকালিক ক্রিয়ায় সেখানে লেখা আছেঃ

তং যজ্ঞং বহির্ষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতং অগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষভযশ্চ যে।।

অর্থাৎ, সৃষ্টির পূর্বে জাত যজ্ঞের সাধনরূপ সে পুরুষের মানসযজ্ঞে প্রোক্ষণাদি দ্বারা সংস্কার করা হয়েছিল। প্রজাপতি প্রভৃতি সাধ্য ও ঋষিগণ যে পুরুষের দ্বারা মানস যাগ সম্পাদন করেছিলেন।

মন্ত্র ৩১/১৪ এ স্পষ্টভাবে লিখিত আছে, "যজ্ঞে পুরুষের মাংসকে হবি বানানো হল।"

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।

উবট ভাষ্যঃ যৎ যস্মাৎকারণাৎ পুরুষেণ হবিষা হবির্ভূতেন দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ, যথা যজ্ঞ অনন্বত বিস্তারিতবন্তঃ। অর্থাৎ যে কারণে পুরুষ রূপী হবি[5] দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতারা যজ্ঞের বিস্তার করলেনঃ দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবন্ধপুরুষং পশুম্। (যজুর্বেদ ৩১/১৫)

উবট ভাষ্যঃ দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ যথা যজ্ঞং পুরুষমেধাখ্যং বিস্তারযন্তঃ পুরুষং পশুং অবন্ধন্

---

১ উবট এবং মহীধর ভাষ্য
২ হোম করার পর অবশিষ্ট সামগ্রী ভক্ষণকারী
৩ দেখুন সত্যার্থপ্রকাশ, ১৮৭৫, পৃ. ৩০৩, দয়ানন্দ ভাবচিত্রাবলী পৃ. ২৮ এ উদ্ধৃত
৪ যেখানে নরবলি দেওয়া হত
৫ হবন সামগ্রী

হতবন্তঃ। অর্থাৎ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা পুরুষমেধ[১] নামক যজ্ঞের বিস্তার করলেন আর তারা পুরুষরূপী পশুর বধ করলেন।

অথর্ববেদে (৬/৭০/১) মদ এবং মাংসের এমন উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তৎকালীন সমাজে এসব ভক্ষণ যে সাধারণ ব্যাপার ছিল তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। সাধারণ কথোপকথনের সময় উপমা হিসেবে এই দুটি জিনিসকে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা হত। যেমনঃ

"তোমার মন যেভাবে মাংসে, সুরায় মজে থাকে, তেমনি তোমার মন সন্তানেও মজুক।"

"অপুপ (মালপুয়া) এবং মাংস যুক্ত চরু বেদীর উপর আনো, যেখান থেকে আমাদের দেবতাদের ভাগ দিতে হবে।" (অথর্ববেদ ১৮/৪/২০)

"তোমার জন্য যে মাখন, ভাত আর মাংস দেই তা তোমার জন্য স্বধ্যাযুক্ত, মধুরতা পূর্ণ এবং ঘি তে পরিপূর্ণ হোক।" (অথর্ববেদ ১৮/৪/৪২)

একইভাবে অথর্ববেদ ১২/২/৭ প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য।

গৃহ্যসূত্রে শূলগব যজ্ঞে গোবলি দেওয়ার বিধান আছে (বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র ২/৭)। কাঠক গৃহ্যসূত্রের ব্যাখ্যাকার দেবপাল শূলগবের অর্থ স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে লিখেছেন- এতে গরুর অঙ্গ শূলে পাকানো হয়। শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র (৪/১৭/৩) অনুসারে, এতে ষাঁড়কে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এর দ্বারা রূদ্রের যজন করা হত। ধানের তুষ, পশুর লেজ, মাথা এবং পা অগ্নিতে হোম করা হত এবং পশুদের রক্ত সাপেদের অর্পন করা হত। শেষে একটি বাছুর পরবর্তী শূলগবের জন্য ছেড়ে দেওয়া হত।

বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র অনুসারে, অরণ্যে স্থাপিত অগ্নিতে গরুর চর্বি এবং মাংস শূলে গেথে এক ছোটো পাত্রে রান্না করা হত এবং অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হত।

বলিপ্রথা

'গোপথ ব্রাহ্মণ' (৩/১৮) এ জানানো হয়েছে বলির পশুর কোন অংশ কে পাবে। গোপথে রয়েছে, "জিভ,গলা,কাঁধ,নিতম্ব এবং পা পুরোহিতের। যজমান পিঠের অংশ নেয়, তার পত্নী শ্রোণীচক্রের অংশ নেয়।" 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও' একই ধরণের বিভাগ চোখে পড়ে।

---

১ নরমেধ

শতপথ ব্রাহ্মণ (৩/১/২/২১) এ গাভীর মাংস খাওয়া উচিত নাকি বৃষের- পুরোহিতদের এই বিবাদ দেখে যাজ্ঞবল্ক্য সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, 'উভয়ের মধ্যে যেটা নরম, আমি তো সেটাই খাইঃ তদু হোবাচ যজ্ঞাবল্ক্যোঅশ্নাম্যেবাহমংসলং চেদ্ ভবতীতি।

বেদের এক পুরাতন ভাষ্যকার মহীধর নিজ ভাষ্যে লিখেছেন গোমেধ যজ্ঞে মৃত গরুর রক্ত এবং হাড় থেকে দুধ এবং কর্পূর তৈরি হয়। এই যজ্ঞের উপর আলোকপাত করে সংস্কৃতের এক বিশ্বকোষ 'শব্দকল্পদ্রুমে' লেখা হয়েছে, "ছাগলের মতই গরুর সম্পূর্ণ প্রয়োগ হওয়া উচিত। গোমেধের ফলে যজমান স্বর্গ এবং মৃত গরু গোলোক লাভ করে।"

কসাইখানার প্রাঙ্গণের মত এমন মাংস এবং রক্তস্নাত পৃষ্ঠাকে দেখেও না দেখার ভান করা শ্রদ্ধান্ধ বৈদিকরা বলেছিল, "এসব হিংসা নয়, প্রকৃতপক্ষে অহিংসা; কারণ বেদে কোথাও একে হিংসা বলা হয়নি। হিংসা আর অহিংসার নির্ণয় বেদ করে। যে হিংসার নির্দেশ বেদে আছে বা যজ্ঞে যে হিংসা করা হয়, তা হিংসা হতে পারে না।"

নিরুক্ত এর প্রথম অধ্যায় থেকে আমরা পরস্পরবিরোধী, আত্মপ্রবঞ্চনাকারী এবং লোকপ্রবঞ্চনাকারী এক কথা জানতে পারি। সেখানে এক বেদ বিরোধীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, "বেদ এবং বেদের বিধান দোষযুক্ত কারণ যজ্ঞে যখন পশু হত্যা করা হয়, তখন যে মন্ত্র পড়া হয় তার অর্থ হলঃ হে খড়গ, এই পশুকে মেরো না।"

এই আক্ষেপের উত্তর দিতে গিয়ে বেদের মর্মজ্ঞ যাস্ক লিখেছেনঃ
আম্নায়বচনাদহিংসাপ্রতিয়েত। অর্থাৎ বেদের আদেশ এমনই, সুতরাং এটা অহিংসাই।

অর্থাৎ এরা পশুদের হত্যা করেও এটাই বলছে যে পশুগুলো মরেনি, কারণ বেদ একে মৃত বলছে না। উক্ত অংশের ভাষ্যে ছজ্জুরাম শাস্ত্রী বিদ্যাভাস্কর প্রাচীন উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ যা বেদবিহিতা হিংসা ন সা হিংসা প্রকীর্তিতা। অর্থাৎ যে হিংসা বেদ অনুমোদিত, তাকে হিংসা বলা যায় না।

'ব্রহ্মবিদ্যার ভাণ্ডার' এবং ভারতীয় দর্শনের আধার উপনিষদও এই হত্যার শিক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারেনি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে লেখা আছেঃ অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পন্ডিতো বিগীতঃ সমিতিংগমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্বান্বেদাননুব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াদিতি মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবা ঔক্ষেণ বার্ষভেণ বা।। (৬/৪/১৮)

অর্থাৎ যারা চায় তার পুত্র সভায় বাগ্মী, সব বেদে পারঙ্গম হোক এবং শতবর্ষজীবি হোক, তাদের বৃষ এবং ষাঁড়ের মাংস রান্না করে তা ঘি এবং ভাতের সাথে মিশিয়ে খাওয়া

উচিত।

পথপ্রদর্শক বিধিসংহিতাসমূহ

বৈদিক যুগের পরে গৃহ্যসূত্রের উৎপত্তি হয়। এগুলো গৃহস্থ জীবনের পথপ্রদর্শক বিধি সংহিতা হিসেবে পরিচিত। এতে যজ্ঞ, দৈনিক, মাসিক এবং পাক্ষিক – সব রকমের কর্তব্যের নির্দেশ রয়েছে। এদের অধ্যয়ণ আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে অনেক সাহায্য করতে পারে। আপস্তম্ভ গৃহ্যসূত্রে[১] লেখা আছে, "যখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কোনো স্নাতক বা আচার্য ঘরে আসবেন, তাকে মধুপর্ক দিয়ে সম্মান করতে হবে। মধুপর্কদাতা গরুকে অতিথির সামনে নিয়ে আসবেন, যদি তিনি আজ্ঞা দেন তাহলে 'গোরহস্যপহতপা' ইত্যাদি মন্ত্র পড়ে গরুটিকে হত্যা করে আগন্তুককে দেবেন।"[২]

একইভাবে 'মানবগৃহ্যসূত্রে' (১/৯/১৯-২২) লেখা আছে, "মধুপর্কে গরু মেরে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের চার ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবেন।" এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে বেদানুসারে মধুপর্ক মাংস ছাড়া হতে পারে না।[৩] এই পুস্তকের সমাবর্তন সংস্কারের বিধানে লেখা আছে, "পূর্ণিমা এবং আমাবস্যায় পশুযাগ করবেন। যজ্ঞের অবশিষ্ট মাংস, মধু এবং লবণ খেয়ে ফেলবেন।" (১/৩/১৯-২০)

আশ্বলায়ণ গৃহ্যসূত্রে[৪] লেখা আছে, "ষাঁড় প্রভৃতির মাংসে তোমাদের যতটা তৃপ্তি হয়, ততটাই বিদ্যাধয়ণেও হোক।" (১/১/৫) "পশুর শরীরের এগারোটি অংশকে রান্না করে তার হৃৎপিণ্ডকে শূলে বিদ্ধ কর এবং উত্তপ্ত করে স্থালীপাকের পূর্বে হবন কর।" (আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১/১১/১২) "যখন শিশু ছয় মাসের হয়ে যাবে, তার মুখে অন্ন দেওয়া উচিত। যিনি অন্নের কামনা করেন তিনি তার শিশুকে ছাগলের মাংস খাওয়াবেন, যিনি ব্রহ্মতেজ চান তিনি তিত্তির পাখির ঝোল খাওয়াবেন" (আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১/১৬/১-৩) "দ্বিতীয় দিন অষ্টমিতে পশু আর স্থালীপাক দিয়ে হবন করবেন।" (আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ২/৪/৭) "অষ্টমির দিন যে পশু মারা হবে, তার মাংস ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করবেন।" (আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ২/৫/২)

মধুপর্ক

---

১ রচনাকাল ১৪০০ খ্রিষ্ট পূর্ব, দেখুন বৈদিক সাহিত্য, ৫২২ পৃষ্ঠা

২ দেখুন উক্ত পুস্তক, ১৩/৫/১৫-১৭

৩ দেখুন ২১ নং সূত্রঃ 'নামাংসো মধুপর্ক ইতি শ্রুতিঃ'

৪ রচনাকাল ১২০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ, দেখুন বৈদিক সাহিত্য পৃষ্ঠা ৫২১

পারস্কর গৃহ্যসূত্রে[১] লেখা আছে, "আচার্য, ঋত্বিক, বৈবাহ্য[২], রাজা, প্রিয়জন, স্নাতক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতির হোক অথবা সমান জাতির হোক, এদের অর্ঘ্য দান করতে হবে। এদের মধ্যে একজন যখন অপরজনের গৃহে আসবেন, তখন তাকে মধুপর্ক প্রভৃতি দিয়ে গৃহপতির আপ্যায়ন করা উচিত। মাংস ছাড়া সৎকার হয়না তাই গোবধ করতে বলা হয়েছে। মধুপর্ক খাওয়া হয়ে গেলে গৃহপতি খড়্গ এবং গরু পূজ্য ব্যক্তির সামনে নিয়ে আসবেন। অতিথি যদি মাংস খেতে চান তাহলে তিনি গোহত্যার অনুমতি দেবেন, তিনি যদি নিরামিষভোজী হয় তাহলে গরুটিকে ছেড়ে দেওয়ার আজ্ঞা দেবেন। যজ্ঞ এবং বিবাহের সময় গরুটিকে ছাড়ার আজ্ঞা দেওয়া উচিত নয়। (পারস্কর গৃহ্যসূত্র, অর্হণ প্রকার নিরূপণ)[৩]

বৈদিক কর্মকাণ্ডের মহাবিদ্বান কুমারিল ভট্টের শিষ্য মহাকবি ভবভূতি তার বিখ্যাত নাটক 'উত্তররামচরিতম্' এর চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে লিখেছেন, ভগবান (?) বাল্মীকির আশ্রমে ভগবান (?) বশিষ্ঠ পৌঁছালে দুই বছরের গরুকে হত্যা করে তার সৎকার করা হয়। দণ্ডায়নের মুখ দিয়ে নাট্যকার বলিয়েছেন, "মধুপর্কে মাংস দেওয়া উচিত- এই বেদবাক্যকে বিশেষভাবে সম্মান করা গৃহস্থেরা বেদজ্ঞ অতিথির জন্য দুই বছরের বাছুর বা বড় বৃষ রান্না করেন। ধর্মসূত্রকার এই ধরণের কর্মকে ধার্মিক কর্ম বলেন।" (উক্ত নাটক, চতুর্থ অঙ্ক)।

এই স্থানের ব্যাখ্যায় 'চন্দ্রকলা' নামক সংস্কৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি' থেকে একটি শ্লোকার্ধ উদ্ধৃত করেছেনঃ মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিযাযোপকল্পয়েৎ। অর্থাৎ বড় বলদ বা বড় ছাগল শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের খাওয়ার জন্য জোগাড় করবেন।[৪] প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ পাঠে এই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হিন্দুসমাজে একসময় গোমাংসভক্ষণ বহুল প্রচলিত ছিল। কিন্তু এর পরেও নিজেদের ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্বজাধারী মনে করে অনেক তথাকথিত ধার্মিক নেতারা প্রায়শই গোরক্ষার নামে উৎপাত করে থাকে। জীবিত মানুষদের অনিবার্য আবশ্যকতাগুলোর কোনো মূল্য তাদের কাছে নেই।

এবার আর্যসমাজি সন্ন্যাসী স্বামী বিদ্যানন্দ তার পুস্তকে যা লিখেছেন তা উদ্ধৃত করতে চাইবো। তিনি লিখেছেন, "সর্দার বল্লভভাই পাটেল এর জন্মস্থান করমসদে[৫] কাঞ্চী কামকোটি পীঠাধীশ জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য শ্রী জয়েন্দ্র সরস্বতী অবস্থান করছিলেন। আমি তার সাথে দেখা করে বললাম, যখন আমরা গোহত্যা নিষিদ্ধ করার দাবী করে থাকি তখন অনেকে প্রায়ই বলে থাকে, যখন হিন্দু শাস্ত্রের অনেক জায়গায় গোবধ করার বিধান

১ রচনাকাল ১০০০ খ্রিষ্ট পূর্ব

২ বর

৩ উত্তররামচরিতম, চৌখম্বা প্রকাশন, ১৯৯৬ এর সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪০৯ এ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত প্রাধ্যাপক কান্তানাথ তৈলঙ্গ এর টিপ্পনী

৪ দেখুন চৌখম্বা প্রকাশন এর 'উত্তররামচরিতম' চন্দ্রকলা ব্যাখ্যা সহিত এর পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২০৭

৫ গুজরাটে অবস্থিত

আছে তখন আপনি কোন মুখে গোহত্যা নিষিদ্ধ করতে চান? জগদ্গুরু হবার কারণে হিন্দু ধর্মে আপনার বিশেষ স্থান রয়েছে, সুতরাং যদি আপনার কাছ থেকে এই বক্তব্যটি প্রচারিত হয় তাহলে অনেক উপকার হবেঃ 'হিন্দু শাস্ত্রে কোথাও গোবধের বিধান নেই। যদি কোথাও গোবধের উল্লেখ মেলে তবে বুঝতে স্বার্থপর লোকেরা এগুলোকে প্রক্ষেপ করেছে অথবা তারা ভুল অনুবাদ করছে। এসবকে প্রমাণ বলে গণ্য করা যায় না।'

শ্রী শঙ্করাচার্য মহাশয় এর উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি আমার বক্তব্যে এতটুকুই লিখতে পারি যে, 'হিন্দু শাস্ত্রে গোমাংস খাওয়ার বিধান নেই'। যখন আমি তাকে এর স্পষ্টীকরণের কথা বললাম তখন তিনি উত্তর দিলেন যে, 'বেদাদি শাস্ত্রে যজ্ঞের জন্য গোহত্যার স্পষ্ট বিধান আছে। যেখানে গোহত্যায় নিষেধ আছে তা মাংস না খাওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার জন্য করা গোহত্যার নিষেধ কোথাও নেই। সব জায়গায় এর অনুমোদন রয়েছে। শাস্ত্রে গরুদের ভালোর জন্যই এমনটা করা হয়েছে, কেননা যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার ফলে নিহত গরু স্বর্গে গমন করে।" (বেদার্থ ভূমিকা, পৃষ্ঠা ২০)

মদ এবং মাংস দিয়ে নদীর পূজা

বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায়, গঙ্গার মত সাত্ত্বিক নদীর পূজার জন্য মদ এবং মাংস উপযুক্ত সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রামায়ণের নায়িকা সীতা যখন গঙ্গা পার হচ্ছিলেন, তখন তিনি গঙ্গাকে বলেন, "হে দেবী, আমি এই নগরে ফিরে তোমাকে হাজার কলস মদ এবং মাংস মিশ্রিত অন্ন দিয়ে পূজা করবো।"[১] অন্যস্থানে সীতার শ্বশুর দশরথ সীতার স্বামী এবং দেবরকে উৎপন্ন করার জন্য যে তথাকথিত 'পুত্রেষ্টিযজ্ঞ' করেছিলেন তাতে ৩০০ পশু-পাখিকে যজ্ঞের যূপে বলি দেওয়ার জন্য বাঁধা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সেই যজ্ঞে কৌশল্যা তিন বার তলোয়ার চালিয়ে একটি ঘোড়াকে হত্যা করেছিলেন। ওই ঘোড়ার চর্বিকে ঋত্বিক[২] ঋষ্যশৃঙ্গ শাস্ত্র বিধান অনুসারে রান্না করেছিলেন। তার ঘ্রাণে দশরথের সব পাপ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। (বালকাণ্ড/১৪/৩১-৩৬)

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৪২ তম সর্গ হতে জানা যায় যে, 'সীতাকে রামচন্দ্র নিজ হাতে মৈরেয় মদ পান করিয়েছিলেন' (১৮-১৯), 'তখন সেবকেরা রামের ভোজনের জন্য নানান রকমের মাংস এবং মিষ্টান্ন নিয়ে এসেছিলেন' (১৯-২০), অযোধ্যাকাণ্ড (৫৬/২৩) থেকে জানা যায়, রাম মৃগমাংস আনিয়ে পর্ণকুটিরের পূজা করেছিলেন এবং লক্ষ্মণ সেই মৃগ হত্যা করেছিলেন। অরণ্যকাণ্ডে (৪৭/২৩) সীতা রাবণকে বলেছিলেন, "এখনই আমার স্বামী অনেক মৃগ, গোধা, শুকরের মাংস নিয়ে আসবেন।" অযোধ্যাকাণ্ডে (৯১/৫২) লেখা আছে ভরতের সাথে আসা অযোধ্যাবাসীদের সৎকার করার জন্য ঋষি ভরদ্বাজ মাতালদের মদ এবং মাংসভোজীদের উত্তম মাংস পরিবেশন করেছিলেন।

১ অযোধ্যা কাণ্ড/ ৫২/৮৯/ গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর প্রকাশন
২ পুরোহিত

মহাভারতে মাংসভক্ষণ

মহাভারতের[1] শান্তিপর্বের ১৪১ তম অধ্যায়ে আছে, বিশ্বামিত্র চণ্ডালের ঘর থেকে মৃত কুকুরের মাংস চুরি করে খেয়েছিলেন। এমন উদাহরণ মনুস্মৃতিতেও (১০/১০৫) আছে।

অজীগর্ত ঋষি নিজের পুত্রকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন এবং নিজের হাতে তাকে বলি দেওয়ার জন্য প্রস্তত হয়ে গিয়েছিলেন। ঋষি বামদেব কুকুরের মাংস খেয়েছিলেন। (মনুস্মৃতি ১০/১০৬)

মহাভারতে ভীমসেনের জন্য মাংসের ঝুড়ি আনার উল্লেখও স্পষ্ট করে দেয় মানুষ খাদ্য হিসাবে মাংস ভোজন করতো। (শল্য পর্ব/৩০/২৩-৩৪) মহাভারতের সভাপর্ব (২২/৯) থেকে জানা যায় পশুর মত মানুষকেও যজ্ঞে বলি দেওয়া হত। প্রাচীনকালে যজ্ঞের অবশেষ খাওয়ার বিধান ছিলঃ যজ্ঞশিষ্টাশিতঃ সন্তো মুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ। (গীতা ৩/১৩) অর্থাৎ যজ্ঞে স্বাহা করার পর অবশিষ্ট সামগ্রী খেলে সব পাপ নষ্ট হয়ে যায়। তাই হতে পারে যে বলি দেওয়ার পর নরমাংসও খাওয়া হত।

রন্তিদেব নামক মহাদানশীল যজ্ঞকর্তার রান্নাঘরে মাংস রান্না করা হত (মহাভারত/ শান্তি পর্ব/অধ্যায় ২৯)। শান্তি পর্ব (২৯/১২৭) থেকে জানা যায় একদিন অতিথিদের জন্য ইনি ২১ হাজার গরু হত্যা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ইনি গোমেধ যজ্ঞে এত গরু হত্যা করেছিলেন যে তার রক্ত, মাংস আর চর্বি থেকে চর্মণ্বতী নামে এক নদীর সৃষ্টি হয়েছিল।[২]

পিতামহ ভীষ্ম বলেন, যে মাংস প্রোক্ষণ দ্বারা[৩] শুদ্ধ করা হয়নি, তা খাওয়া অনুচিত। (মহাভারত/অনুশাসন পর্ব/অধ্যায় ১১৫) অগস্ত্য নিজ তপের দ্বারা পশুদের প্রোক্ষিত করে পবিত্র বানিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে দেবতা ও পিতৃদের ক্রিয়ায় মাংসের ব্যবহার ভ্রষ্ট এবং পাপজনক রইলো না বরং তা ন্যায়ানুকুল হল। পিতৃরাও মাংসে প্রসন্ন হন। (অনুশাসন পর্ব, ১১৫/৫৯-৬০) "ভীষ্ম বলেন, হে পরন্তপ, মাংসরসের চেয়ে উত্তম পদার্থ পৃথিবীতে আর নেই। দুর্বল, দুঃখী এবং ক্লান্তদের জন্য এ ভীষণ উপযোগী। মাংস প্রাণকে বর্ধিত করে এবং খুব শীঘ্রই পুষ্টি সরবরাহ করে। হে পরন্তপ! মাংসের চেয়ে

---

১ এর বর্তমান স্বরূপ ৫০ খ্রিষ্ট পূর্বে বর্তমান ছিল, দেখুন সি.বি. বৈদ এর পুস্তক-মহাভারতঃ এ ক্রিটিসিজম, পৃষ্ঠা ১০

২ শান্তিপর্ব/২৯/১২৩ এবং মেঘদূত এর ৪৫ তম শ্লোক এর মল্লীনাথের সংস্কৃত ব্যাখ্যা

৩ অর্থাৎ মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে

অধিক ভোজনীয় আর কিছুই নেই।“ (অনুশাসন পর্ব/৬/৭-১০)

মহাভারতের ব্রাহ্মণ-ব্যাধ সংবাদ থেকে বোঝা যায় তৎকালীন সময়ের মানুষেরা মাংস ভক্ষণ করতো। মহাভারত থেকে এই বিষয়ে প্রচুর তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে। এসব বর্ণনা এতটাই মাংস এবং রক্তে স্নাত যে তা কসাইখানার বিবরণ বলেই মনে হয়।

মাংসের ব্যাপারে মনুর সিদ্ধান্ত অনেকস্থানে ভীষণ স্বেচ্ছাচারী। এসব পড়ার পরেও পরম্পরাবাদীরা কেন জানি না একে ‘ধর্মশাস্ত্র’-ই বলে আসছে এবং একে মান্য করে আসছে! মনু এমনও লিখেছেন, “কুকুর,বানর প্রভৃতি যেসব পশুদের পাঁচটি নখ থাকে, তাদের মধ্যে শজারু, শল্য, গণ্ডার, গোসাপ, কচ্ছপ এবং এক পাটি দাঁত বিশিষ্ট পশুদের মধ্যে উট ছাড়া গরু প্রভৃতি প্রাণীকে ভক্ষণ করা যায়।” (মনুস্মৃতি ৫/১৮)

“প্রজাপতি স্থাবর এবং জঙ্গমের সকল প্রাণীকে খাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন। বিচরণশীল পশুরা নিশ্চল তৃণ আহার করে, হস্তযুক্ত হস্তহীনকে ভক্ষণ করে।” (মনুস্মৃতি ৫/২৯)

“ক্রয় করে বা দেবতাদের ভোগ দিয়ে যদি মাংস ভক্ষণ করা হয় তবে তাতে কোনো দোষ হয় না।” (মনুস্মৃতি ৫/৩২)

“শ্রাদ্ধ এবং মধুপর্কের সময় শাস্ত্রের বিধি বিধান অনুসারে প্রস্তুত মাংস যে খায় না, সে ২১ বার পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।” (মনুস্মৃতি ৫/৩৫)

“প্রজাপতি যজ্ঞের জন্য পশুদের সৃষ্টি করেছেন। তাই যজ্ঞে পশু বধ করলে হত্যার দোষ হয় না। যজ্ঞে নিহত পশু, পাখি এবং কচ্ছপ প্রভৃতি জন্তু পরবর্তী জন্মে উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।” (মনুস্মৃতি ৫/৩৯)

“মাংস খাওয়ায় কোনো দোষ নেই, এটা প্রাণীদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।” (মনুস্মৃতি ৫/৫৬)

স্মৃতিতে মাংস ভক্ষণ

এখানেই শেষ হচ্ছে না, মনু শ্রাদ্ধের প্রসঙ্গে আলাদা আলাদা মাংসে পিতৃদের কতটা কতটা তৃপ্তি হয় তারও বিবরণ দিয়েছেন, “শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদের মাছ খাওয়ালে পিতৃরা দুইমাস তৃপ্ত থাকেন এবং হরিণের মাংস খাওয়ালে তিনমাস তৃপ্ত থাকেন।” (৩/২৬৮) “ছাগলের মাংসে ছয় মাস তৃপ্তি হয়। কচ্ছপ এবং খরগোশের মাংসে ১১ মাস তৃপ্তি হয়। গণ্ডারের মাংসে ১২ বছর অবধি তৃপ্তি হয়।” (৩/২৬৯-২৭১)

বর্তমানের হিন্দু ধর্ম মূলত পুরাণের উপর ভিত্তি করে চলছে। পুরাণে মাংস খাওয়া কোনো দোষের নয় বরং শুধুমাত্র মাংস খান এমন দেবতাদের কল্পনা পুরাণে করা হয়েছে যেমনঃ ভৈরব, কালিকা, চণ্ডি প্রভৃতি। দেবী কালিকার পূজার সামগ্রী দেখুন- সিংহবাহিনী দেবীকে মালতী ফুল, দীপ,পশুবলি, মদ, মাংস এবং চর্বি দিয়ে পূজা করবে। (ভবিষ্যপুরাণ, উত্তরপর্ব ৬১/৫১-৫২)

পুরাণে মাংস ভক্ষণ

'মার্কণ্ডেয় পুরাণের' 'দূর্গাসপ্তশতী' নামে একটি অংশ রয়েছে যাকে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক বলা যায়, যেমন গীতা মহাভারতের একটি অংশ হবার পরও স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত। তান্ত্রিক, পৌরাণিক এবং দেবীভক্তদের কাছে চণ্ডীর বড়ই মহিমা। এই পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ে রক্তবীজ অসুরের বধ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে যে কালিকা তার গলা ছিন্ন করে তার গরম রক্ত পান করেছিলেন। (শ্লোক ৫৯)

এই প্রকারের দেবদেবীদের উপাসকেরা নিজেরা যদি মাংস ভক্ষণ করে থাকে তবে তা বিস্ময়ের কিছু নয়, কেননা সিদ্ধান্ত হলঃ যদন্নঃ পুরুষস্তদন্নাঃ স্যাদ্ দেবতাঃ। (নিদানসূত্র ১০/৯)

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে (৬১/৯৬) লেখা আছে ব্রাহ্মণেরা পাঁচ কোটি গরুর মাংস খেয়েছিলেন। এই গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১০৫ তম অধ্যায়ে আছে, রুক্মিণীর বিবাহে তার ভাই রুক্মী এক লক্ষ গরু, দুই লক্ষ হরিণ, চার লক্ষ খরগোশ, চার লক্ষ কচ্ছপ, দশ লক্ষ ছাগল এবং ষোলো লক্ষ ভেড়া হত্যা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

তান্ত্রিক সাহিত্যে মাংস ভক্ষণ

তান্ত্রিকদের প্রায় সকল সম্প্রদায় শাক্ত, শৈব, কাপালিক, কালমুখ প্রভৃতি মাংস এবং মদকে সম্মানের চোখে দেখে এবং প্রয়োজনীয় বলেই মনে করে। তাদের নিন্দনীয় উপাসনা পদ্ধতিতে এই দুটি পদার্থের বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। তাদের কালি, ভৈরব প্রভৃতি দেবতা এই দুই পদার্থের সাহায্যেই জীবিত থাকেন। আজও অনেক মন্দির ও তার দেওয়ালের বাইরে কালি ও ভৈরবের যে মূর্তি এবং চিত্র দেখা যায় তাতে একহাতে নরমুণ্ড এবং অন্য হাতে রক্ত ভর্তি মাথার খুলি দেখা যায়। এই সম্প্রদায়ের যেসব লিখিত গ্রন্থ আছে তাতেও মাংস প্রভৃতির মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা রয়েছে। 'কালিতন্ত্র' নামক পুস্তকে লেখা আছে, " মদ্য, মাংস, মাছ, মুদ্রা, মৈথুন এই পঞ্চ মকার যুগে যুগে মোক্ষ প্রদান করে।" (সত্যার্থ প্রকাশ, ১১ সমুল্লাস এ উদ্ধৃত শ্লোক) হঠযোগপ্রদীপিকায় লেখা আছে, "যে নিত্য গোমাংস খায়, মদ্য পান করে তাকেই আমি প্রকৃত কুলীন বলে মনে করি,

বাকিরা তো হল কুলকলঙ্ক।”

গোমাংসং ভক্ষয়েন্নিত্যং পিবেদমরবারুণীম্।
কুলীনং তমহং মন্যে চেতরে কুলঘাতকাঃ।।
হঠযোগপ্রদীপিকা ৩/৪৭

তুলসী নিজে সম্ভবত মাংসাহারী ছিলেন না, কিন্তু তিনি তার চরিতনায়ক, আদর্শমানব এর বিষয়ে লিখেছেনঃ

বন্ধু সখা সঙ্গ লেহিং বোলাই,
বন মৃগয়া নিত খেলহিং জাই।
পাবন মৃগ মারহিং জিয় জানী।[১]

অর্থাৎ রাম প্রতিদিন নিজের সাথীদের সাথে মৃগ বধ করতেন।

তুলসী বিরচিত বালকাণ্ডে (পৃ ১৪০) ভানুপ্রতাপ প্রসঙ্গে রয়েছেঃ বিবিধ মৃগনহ কর আমিষ রান্ধা, তেহী মহুং বিপ্র মাংসু খল সান্ধা। অর্থাৎ অনেক প্রকারের মৃগের মাংস রান্না করা হল, নীচ ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণদের খাবারেও মাংস মিশিয়ে দিল।

এইসব তথ্যের বিচারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে, বুদ্ধ এবং মহাবীর এর ‘অহিংসা পরমো ধর্মঃ’ এর দেশে মাংস মানুষের এক আবশ্যক খাদ্য উপাদান ছিল। আর একসমময় এই মাংসের জন্য গরু, গোসাপ, খরগোশ, শজারু, গণ্ডার, মৃগ, মাছ, বৃষ, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, কচ্ছপ এবং মানুষ সবার গলায় নির্মমভাবে ছুরি চালানো হয়েছিল। মাংসকে দেবতা, পিতৃ, বেদজ্ঞ, স্নাতকদের সংস্কারের জন্য উপযুক্ত বলেই মনে করা হত।

---

১ রামচরিতমানস, বালকাণ্ড, দোহা ২০৪ এর পর, পৃষ্ঠা ১৬৪, সটীক, মাঝারি সাইজ, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর

প্রাচীন ভারতে গোহত্যা এবং গোমাংসাহার

ভারতে কয়েকদিন পর পরই গোহত্যা নিয়ে সংহিসতা দেখা দেয়। গোহত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুমকিও দেয়া হয় এবং এর বিরুদ্ধে নানা বিলও পাশ করানো হয় কিন্তু ভারতে সবসময়ই যে গরু পূজ্য এবং অবধ্য ছিল, এমন নয়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে গরুকে শুধু যে যজ্ঞে বলি হিসাবে হত্যা করা হত তাই নয় বরং বিশেষ অতিথি, বেদজ্ঞ প্রভৃতিকে আপ্যায়ণ করারও জন্যও গোমাংসের ব্যবস্থা করা হত।

হয়তো এজন্যই আধুনিকালের প্রসিদ্ধ হিন্দু ধর্মপ্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “আপনারা শুনে অবাক হবেন, প্রাচীন রীতি অনুযায়ী গরু না খেলে ভালো হিন্দু হওয়া যেত না। হিন্দুদের কিছু অনুষ্ঠানে অবশ্যই বৃষ বলি দিয়ে তার মাংস খেতে হত।”[১] এছাড়াও বিবেকানন্দ বলেছেন, “ভারতে এমন এক সময় ছিল, যখন গোমাংস না খেয়ে কোনো ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ থাকতে পারতেন না।”[২]

প্রাচীন সাহিত্যে গোমেধ নামে এক যজ্ঞের বিবরণ পাওয়া যায়, যেখানে গরু বলি দেওয়া হত। প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ শব্দকল্পদ্রুমে এই যজ্ঞের বিবরণে বলা হয়েছেঃ গোমেধঃ যজ্ঞবিশেষঃ, অত্র স্ত্রীগোপশুঃ মন্ত্রেষু স্ত্রীলিংগপাঠাৎ তস্য লক্ষণম্-সপ্তশফত্ব-নবশফত্ব-ভগ্নশৃংগত্ব-কাণত্ব-ছিন্নকর্ণত্বা-দিদোষরাহিত্যম্। তস্য প্রয়োগঃ সর্বোঅপি ছাগপশুবত্। যজমানস্য স্বর্গঃ ফলম্, গোশ্চ গোলোকপ্রাপ্তিঃ।

অর্থাৎ গোমেধ এক বিশেষ ধরণের যজ্ঞ। এখানে ‘গো’ শব্দ দ্বারা স্ত্রী গোপশু অর্থাৎ গাভীকে বোঝানো হয়েছে, ষাঁড়, বৃষ বা বাছুর বোঝানো হয়নি, কেননা মন্ত্রে স্ত্রীলিঙ্গের নির্দেশ আছে। সেই গরুর যে লক্ষণ থাকা উচিতঃ সে সাত বা নয় খুর যুক্ত হবে না, তার শিং ভাঙ্গা হবে না, সে অন্ধ হবে না, তার কান ছিন্ন হবে না। ছাগলের মত তার সর্বোচ্চ প্রয়োগ হওয়া উচিত অর্থাৎ গরুর সাথেও তাই করা উচিত যা ছাগলের সাথে করা হয়ে থাকে। গোমেধের ফলে যজমান স্বর্গ এবং গরু গোলোক প্রাপ্ত হয়।

যজ্ঞে পশুদের সাথে যেমন আচরণ করা হত

যজ্ঞে ছাগল, ঘোড়া এবং গরু প্রভৃতি পশুদের সাথে যেমন আচরণ করার নির্দেশ , ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেওয়া হয়েছেঃ

---

১ দেখুন, দা কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ স্বামী বিবেকানন্দ, ভাগ ৩, পৃষ্ঠা ৫৩৬

২ উক্ত পুস্তকের ১৭৪ পৃষ্ঠা

উদীচীনাং অস্য পদো নিধত্তাত্ সূর্যং চক্ষুর্গময়তাদ্ বাতং প্রাণমন্ববসৃজতাদন্তরিক্ষমসুং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীরমিত্যেষ্বেবৈনং তল্লোকেষ্বাদধাতি ইতি। একধাঅস্য ত্বচমাচ্ছ্যতাত্ পুরা নাভ্যা অপি শসো বপামুৎখিদতাদন্তরেবোষ্মাণং বারয়ধ্বাদিতি পশুষ্বেব তত্ প্রাণান্দধাতি ইতি। শ্যেনমস্য বক্ষঃ কৃণুতাত্ প্রশসা বাহু শলা দোষণী কশ্যপেবাংসাহচ্ছিদ্রে শ্রোণী কবষোরু স্রেকপর্ণাঅষ্ঠীবন্তা ষড়বিংশতিরস্য বঙ্ক্রয়স্তা অনুষ্ঠ্যোচ্চ্যাবয়তাদ্ গাত্রং গাত্রমস্যানূনং কৃণুতাদ্ ইতি অংগান্যেবাস্য তদ্ গাত্রাণি প্রীণাতি ইতি। ... ঊবধ্যগোহং পার্থিবং খনতাদিতি... অস্না রক্ষঃ সংসৃজতাদিতি। (৬/৬-৭)

অর্থাৎ, ইহার পা উত্তরদিক আশ্রয় করুক, চক্ষু সূর্যকে প্রাপ্ত হউক, প্রাণ বায়ুকে, জীবন অন্তরিক্ষকে, শ্রোত্র দিকসমূহকে ও শরীর পৃথিবীকে আশ্রয় করুক- এই বাক্যে ইহাকে ঐ সকল লোকে স্থাপন করা হয়। ইহার ত্বক একভাবে (অবিছিন্নভাবে) ছিন্ন কর। ছেদনের পূর্বে নাভি হইতে বপা (মেদ) পৃথক কর, প্রশ্বাসকে ভিতরেই নিবারণ কর (শ্বাসরোধ করিয়া বধ কর) – এই বাক্যে পশুসমূহেই প্রাণসকলের স্থাপনা হয়। ইহার বক্ষ শ্যেনের (পক্ষীর) আকৃতিযুক্ত কর (সেইরূপে ছিন্ন কর), বাহুদ্বয় উত্তমরূপে ছিন্ন কর, শ্রোণিদ্বয় অচ্ছিদ্র কর, উরুদ্বয় কবষের (ঢালের) মত ও উরুমূল করবীর পাত্রের মত কর; ইহার পার্শ্বাস্থি ছাব্বিশখানি , সেগুলি পরপর পৃথক কর; সমস্ত গাত্র অবিকল (ছিন্ন) কর – এই বাক্যে ইহার সমস্ত অঙ্গ ও গাত্রকে প্রীত করা হয়। ইহার পুরীষ গোপনের জন্য স্থান (গর্ত) পৃথিবীতে (ভূমিতে) খনন কর।... রুধিরের সহিত রাক্ষসগণের যোজনা কর।[১]

পশুদের অঙ্গের বিভাগ

এরপর সেই ব্রাহ্মণগ্রন্থ বলির পশুর অঙ্গের বিভাগের বিধান সম্বন্ধে বলছেঃ

অথাতঃ পশোর্বিভক্তিস্তস্য বিভাগং বক্ষ্যামঃ, ইতি। হনু সজিহ্বে প্রস্তোতুঃ শ্যেনং বক্ষ উদ্গাতুঃ কণ্ঠঃ কাকুদ্রঃ প্রতিহর্তুর্দক্ষিণা শ্রোণির্হোতুঃ সব্যা ব্রহ্মণো দক্ষিণং সক্থি মৈত্রাবরুণস্য সব্যং ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনো দক্ষিণং পার্শ্বং সাংসমধ্বর্যোঃ সব্যমুপগাতৃণাং সব্যোংঅসঃ[২] প্রতিপ্রস্থাতুর্দক্ষিণং দোর্নেষ্টুঃ সব্যং পোতুর্দক্ষিণ ঊরুরচ্ছাবাকস্য সব্য আগ্নীধ্রস্য দক্ষিণো বাহুরাত্রেয়স্য সব্যঃ সদস্যস্য সদং চানুকং চ গৃহপতের্দক্ষিণৌ পাদৌ গৃহপতের্ব্রতপ্রদস্য সব্যৌ পাদৌ গৃহপতের্ভার্যায়ৈ ব্রতপ্রদস্যৌষ্ঠ এনয়োঃ সাধারণো ভবতি তং গৃহপতিরেব প্রশিংষ্যাজ্জাঘনীং পত্নীভ্যো হরন্তি তাং ব্রাহ্মণায় দদ্যুঃ স্কন্ধ্যাশ্চ মণিকাস্তিস্রশ্চ কীকসা গ্রাবস্তুতস্তিস্রশ্চৈব কীকসা অর্ধং চ বৈকর্তস্যোন্নেতুর্ধং চৈব বৈকর্তস্য ক্লোমা চ শামিতুস্তদ্ব্রাহ্মণায় দদ্যাদ্ যদ্যব্রাহ্মণঃ স্যাচ্ছিরঃ সুব্রহ্মণ্যায়ৈ যঃ শ্বঃসুত্যাং প্রাহ তস্যাজিনমিড়া সর্বেষাং হোতুর্বা ইতি। তা বা এতাঃ ষট্ত্রিংশত্মেকপদা যজ্ঞং বহন্তি

১ অনুবাদকঃ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

২ বাংলাতে লুপ্ত অ বোঝানোর জন্য কোনো বর্ণমালা নেই, তাই লুপ অ এর স্থানে 'অ' অক্ষরই ব্যবহার করা হয়েছে।

ষট্‌ত্রিংশদক্ষরা বৈ বৃহতী। বাহর্তাঃ স্বর্গা লোকাঃ প্রাণাংশ্চৈব তৎস্বর্গাংশ্চ লোকানাপ্লুবন্তি প্রাণেষু চৈব তৎস্বর্গেষু চ লোকেষু প্রতিতিষ্ঠন্তো যন্তি ইতি।
স এভ স্বর্গ্যঃ পশুর্ এনমেবং বিভজন্তি, ইতি। অথ যেঅতোঅন্যথা তদ্ যথা সেলগা বা পাপকৃতো বা পশুং বিমথ্নীরংস্তাদৃক্তত্ ইতি। তাং বা এতাং পশোর্বিভক্তিং শ্রৌত ঋষির্দেবভাগো বিদাংচকার তামু হা প্রোচ্যৈবাস্মাল্লোকাদুচ্চক্রামত্ ইতি। তামু হ গিরিজায় বাভ্রব্যায়ামনুষ্যঃ প্রোবাচ ততো হৈনামেতদর্বাঙ্ মনুষ্যা অধীয়তেহধীয়তে... ইতি। (অধ্যায় ৩১)

অর্থাৎ, অনন্তর পশুবিভাগ, পশুর বিভাগের বিষয় বলিব। জিহ্বাসহিত হনুদ্বয় প্রস্তোতার ভাগ; শ্যেনাকৃতি বক্ষ উদ্গাতার; কণ্ঠ ও কাকুদ্র প্রতিহর্দার ; দক্ষিণ শ্রোণি হোতার; বাম শ্রোণি ব্রহ্মার; দক্ষিণ সক্থি মৈত্রাবরুণের; বাম সক্থি ব্রহ্মণাচ্ছংসীর; অংশসহিত দক্ষিণ পার্শ্ব অধ্বর্য্যুর; বাম পার্শ্ব উদ্গাতাদিগের; বাম অংস প্রতিপ্রস্থাতার; দক্ষিণ দোঃ নেষ্টার; বাম দোঃ পোতার; দক্ষিণ উরু অচ্ছাবাকের; বাম উরু অগ্নাধ্রেয়ের; দক্ষিণ বাহু আত্রেয়ের; বামবাহু সদস্যের; সদ ও অনূক গৃহপতির; দক্ষিণ পদদ্বয় গৃহপতির ব্রতদাতার। ওষ্ঠ উভয় ব্রতদাতার সাধারণ ভাগ; গৃহপতি উহা [দুইজনকে] বিভাগ করিয়া দিবেন। জঘনী পত্নীদিগকে দেওয়া হয়; পত্নীরা তাহা কোনো ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। স্কন্ধস্থিত মণিকা ও তিনখানি কীকস গ্রাবস্তুতের; [অন্য পার্শ্বের আর] তিন খানি কীকস ও বৈকর্ত্তের; অর্ধেক উন্নেতার; বৈকর্ত্তের অপরার্ধ ও ক্লোম শমিতার। শমিতা অব্রাহ্মণ হইলে ঐ ভাগ কোনো ব্রাহ্মণকে দান করিবে। মস্তক সুব্রহ্মণ্যাকে দিবে। "শ্ব সুত্যাং" এই নিগদ যিনি পাঠ করেন, সেই আগ্নীধ্রের ভাগ অজিন। আর সবনীয় পশুর যে ইড়াভাগ হইবে, তাহা সর্ব সাধারণের বা একাকী হোতার।

এক এক পদে অভিহিত ঐ অবয়বগুলি এইরূপে ছত্রিশটি ভাগে পরিণত হইয়া যজ্ঞ নির্বাহ করে। বৃহতীর ছত্রিশ অক্ষর; স্বর্গলোক বৃহতীর সম্বন্ধযুক্ত , এতদ্বারা প্রাণ ও স্বর্গলোক লাভ করা যায় এবং এতদ্বারা প্রাণে ও স্বর্গালোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। যাহারা পশুকে এইরূপে বিভাগ করেন তাহাদের পক্ষে সেই পশু স্বর্গের অনুকূল হয়। যাহারা অন্য কোনোরূপে পশুবিভাগ করেন, তাহারা অন্ন কামুক (উদরপরায়ণ) পাপকারীর মত কেবল পশুহত্যা করে।

পশুবিভাগের এই বিধি শ্রুতের পুত্র দেবভাগ নামক ঋষি জানিতেন; তিনি কাহারো নিকট ইহা প্রকাশ না করিয়াই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। কোনো অমনুষ্য উহা বভ্রুর পুত্র গিরিজকে বলিয়াছিলেন, তাহার পরবর্তী মনুষ্যেরা তদবধি উহা জানিয়া আসিতেছে।[১]

গোপথ ব্রাহ্মণ ৩/১৮ তে প্রায় একই কথা বলা হয়েছে।

১ অনুবাদকঃ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ঋগবেদ ১০/৮৬/১৪ এ ইন্দ্রদেব গোবধের কথা বলেছেনঃ

উক্ষো হি মে পঞ্চদশ সাকং পচন্তি বিংশতিম্।
উতাহমদ্মি পীব ইদুভা কুক্ষী পৃণন্তি মে বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ।।

অর্থাৎ, আমার জন্য পঞ্চদশ এমন কি বিংশ বৃষ পাক করিয়া দেয়। আমি খাইয়া শরীরের স্থূলতা সম্পাদন করি, আমার উদরের দু'পার্শ্ব পূর্ণ হয়, ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

ঋগবেদ ১০ম মণ্ডলের ৮৯ সুক্তের ১৪ ঋক থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, গোহত্যা এতই সাধারণ একটি ব্যাপার ছিল যে কথাবার্তার সময় উপমা হিসেবে এটি ব্যবহৃত হত। দেখুনঃ

মিত্রক্রুবো যচ্ছসনে ন গাবঃ পৃথিব্যা আপৃগমুয়া শয়ন্তে।।

অর্থাৎ, হে ইন্দ্র! যেমনি গোহত্যাস্থানে গাভীরা হত হয়, তেমনি তোমার ওই অস্ত্র দ্বারা নিহত হয়ে বন্ধুদ্বেষী রাক্ষসগণ পৃথিবীতে পতিত হয়ে শয়ণ করে।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তার সত্যার্থ প্রকাশে এই গোমেধ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "যেখানে গোমেধ যজ্ঞের কথা লেখা হয়েছে, সেখানে পুরুষ পশুদের হত্যা করার কথা লেখা হয়েছে। কেননা যেমন পুষ্ট বৃষ প্রভৃতি পুরুষদের মধ্যে থাকে, তেমন স্ত্রীদের মধ্যে থাকে না। বন্ধ্যা গাভীদেরও গোমেধ যজ্ঞে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে।"[১]

ভারতীয় বিদ্যা ভবন, মুম্বাই এর তত্ত্বাবধানে ছাপা ' দ্যা বৈদিক এজ' এর ৩৮৭ পৃষ্ঠায় ডা. বি. এম. আপ্তে লিখেছেন, "ঋগবেদের একটি সুক্ত (১০/৮৫) যাকে বিবাহ সুক্ত বলা হয়, তার থেকে বিবাহ সংস্কারের প্রাচীনতম রূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। বর এবং বরযাত্রী কনের বাড়িতে যেত (১০/১৭/১)। এখানে কনে বরযাত্রীদের সাথে খাবার খেত। সেই অনুষ্ঠানে অতিথিদের গরুর মাংস পরিবেশন করা হত।" (১০/৮৫/১৩)

'বৈদিক ইন্ডেক্স' (খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪৫) এ বলা হয়েছে, "বিবাহ সংস্কারকালে ভোজনের সময় গোহত্যা করা হত।"

এই কথাই বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত 'বৈদিক কোশ' (পৃষ্ঠা ৩৭৪) এ

১ দেখুন, সত্যার্থ প্রকাশ, ১৮৭৫ সাল, পৃষ্ঠা ৩০৩, দয়ানন্দ ভাব চিত্রাবলী, পৃষ্ঠা ২৮ এ উদ্ধৃত

বলা হয়েছে এবং তথ্যসূত্র হিসেবে ঋগবেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ তম সুক্তের ১৩ নং ঋকের উল্লেখ করা হয়েছে।

ঋগ্বেদ ১০/১৬/৭ এ পাওয়া যায় শবদাহ কালে গোহত্যা করা হতঃ

অগ্নের্বর্ম পরি গোভির্ব্যয়স্ব সং প্রোর্ণূষ্ব পীবসা মেদসা চ ।

অর্থাৎ, হে মৃত! তুমি গোচর্মের সাথে অগ্নি শিখা স্বরূপ কবচ ধারণ কর, তোমার প্রচুর মেদের দ্বারা তুমি আচ্ছাদিত হও।

'বৈদিক কোশ'[১] এর ৩৭৫ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, "অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় গোবধ আবশ্যক ছিল বলে জানা যায়। গরুর মাংস দিয়ে শবকে ঢাকার উল্লেখ পাওয়া যায়।" (ঋগ্বেদ ১০/১৬/৭)

গোহত্যা শুভ

শ্রী মুকন্দীলাল তার পুস্তক 'cow slaughter- honors of a dillema' এর ১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "প্রাচীন ভারতে কোনো অনুষ্ঠানে গোহত্যা করা শুভ বলে মনে করা হত। বর-কনে বেদির সামনে বৃষের কাঁচা চামড়ার উপর বসতো। ওই চামড়া বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে হত্যা করা গরুরই হয়ে থাকবে, যে গরুটি ঐ অনুষ্ঠানে খাওয়ার জন্য হত্যা করা হয়েছিল। একইভাবে রাজ্যাভিষেকের সময় ভাবী রাজাকে লাল বৃষের চামড়ায় বসানো হত।"

অন্ন প্রাপ্তির কামনায় যে যজ্ঞ করা হত, সেখানে ইন্দ্রের জন্য বৃষ রান্না করা হত, ঋগ্বেদ ১০/২৮/৩ থেকে এমনটাই জানা যায়ঃ

অদ্রিণা তে মন্দিন ইন্দ্র তূযান্ৎসূন্বন্তি সোমান্পিবসি ত্বমেষাম্।
পচন্তি তে বৃষভাং অৎসি তেষাং পৃক্ষেণ যন্মঘবন্ হূযমানঃ।।

অর্থাৎ, "হে ইন্দ্র! যখন অন্ন কামনাতে তোমার উদ্দেশ্যে হোম করা হয়, তখন তারা শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তরফলক সহযোগে মাদকতাশক্তিযুক্ত সোমরস প্রস্তুত করে, তুমি তা পান কর। তারা বৃষভ সমূহ পাক করে, তুমি তাহা ভোজন কর।"

ঋগ্বেদ ৭/১৯/৮ এ দিবোদাস নামক এক বৈদিক রাজার উল্লেখ মেলে। তার নামের সাথে

---

১ বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

'অতিথিগ্ব' বিশেষণ রয়েছে। 'অতিথিগ্ব' এর অর্থ অনেকে 'অতিথির জন্য গোহত্যাকারী' করেন। (বৈদিক কোশ, পৃষ্ঠা ৩৭৪)

যজুর্বেদে গরুর চর্বি দিয়ে পিতৃদের তৃপ্ত করার কথা পাওয়া যায়ঃ

বহ বপাং জাতবেদঃ পিতৃভ্যো যত্রৈনান্বেত্থ নিহিতানপরাকে,
মেদসঃ কুল্যা উপ তান্স্রবন্তু সত্যা এষামাশিষঃ সন্নমন্তাং স্বাহা।
-যজুর্বেদ ৩৫/২০

মহীধর ভাষ্যঃ হে জাতবেদঃ, জাতং বেদো ধনং যস্মাত্ স জাতবেদাঃ তৎসংবোধনে হে জাতবেদঃ, পিতৃভ্যোর্থায় ত্বং বপাং ধেনুসংবন্ধি চর্মবিশেষং ত্বং বহ প্রাপয়। পরাকে পরাক্রান্তে দুরেঅপি যত্র যস্মিন্দেশে নিহিতানস্থাপিতানেনাপ্নিতৃন্ ত্বং বেত্থ জানাসি তত্র বহেত্যর্থঃ। তস্যাঃ বপায়াঃ নিঃসৃত্য মেদসঃ ধাতুবিশেষস্য কুল্যাঃ নদ্যঃ তান্ পিতৃন্ প্রতি উপস্রবংতু প্রসরংতু, কিংচ এষাং দাতৃণামাশিষঃ মনোরথাঃ সত্যাঃ অবিতথাঃ সন্নমংতাং প্রহ্লীভবন্তু স্বাহা, সুহুতমস্তু।

অর্থাৎ, হে জাতবেদ, পিতৃদের জন্য তুমি গোচর্ম বিশেষ নিয়ে যাও। তুমি দূরে স্থিত পিতৃদের চেনো। ওই চর্মবিশেষ হতে বের হওয়া মজ্জার (চর্বি) নদী, পিতৃ, তার জন্য দানকারীর সকল কামনা পূর্ণ হোক।

ঋগ্বেদ ৯/৪/১ এর ভাষ্যের ভূমিকায় চার বেদের ভাষ্যকার সায়ণ লিখেছেনঃ ব্রাহ্মণো বৃষভং হত্বা তন্মাংসং ভিন্ন-ভিন্নদেবতাভ্যো জুহোতি। তত্র বৃষভস্য প্রশংসা তদংগাতাং চ কতমানি কতমদেবেভ্যঃ প্রিয়াণি ভবন্তি তদ্ বিবেচনম্। বৃষভবলিহবনস্য মহত্ত্বং চ বর্ণ্যতে। তদুৎপন্নং শ্রেয়শ্চ স্তুয়তে।

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ বৃষভকে হত্যা করে তার মাংসকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেয়। এতে বৃষভের প্রশংসা এবং তার কোন কোন অঙ্গ কোন কোন দেবতার প্রিয় – তা বিবেচনা করা হয়েছে এবং বৃষভের বলি দিয়ে হবন করার মাহাত্ম্য এবং তার ফলে লাভ করা শ্রেয়ের বর্ণনা করা হয়েছে।

বৃষের বলি

শতপথ ব্রাহ্মণ ৩/৪/১/২ এ লেখা আছে আছে অতিথির জন্য মহোক্ষ (বড় বৃষ) হত্যা করা উচিত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২/৭/১১/১ থেকে জানা যায় যে অগস্ত নামের এক যজ্ঞকর্তা ১০০ বৃষের বলি দিয়েছলেন। এই কথাই পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ২১/১৪/৫ এ বলা

হয়েছে।

শতপথব্রাহ্মণ ৩/১/২/২১ এ পুরোহিতেরা পরস্পরের সাথে এ বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন যে বৃষের মাংস খাওয়া উচিত নাকি গাভীর! যাজ্ঞবল্ক্য বললেনঃ অশ্নাম্যেব অহং অংসলং চেদ ভবতীতি। অর্থাৎ 'দুটোর মধ্যে যার মাংস নরম, আমি তাই খাই'।

গৃহ্যসূত্রগুলোতে শূলগব নামক এক যজ্ঞের বিধান দেওয়া হয়েছে। কাঠক গৃহ্যসূত্রের ব্যাখ্যাকার দেবপালের মত অনুসারে, শূলগবকে শূলগব বলার কারণ হল এতে গরুর অঙ্গ শূলে পাকানো হয়। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের ব্যাখ্যাকার নারায়ণের মতে রূদ্রের সাথে এই কর্মের সম্পর্ক থাকায় একে শূলগব বলা হয়। এতে ষাঁড়ের সংজ্ঞপন[১] করে রুদ্রের জন্য যজন করা হয়। পশুর লেজ, চামড়া, মাথা এবং পা অগ্নিতে হোম করা হয়। পশুর রক্ত সর্পদের উৎসর্গ করা হয়। এর পরে একটি বাছুর পরবর্তী শূলগবের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়।

বৌধায়ণ গৃহ্যসূত্র অনুসারে অরণ্যে স্থাপন করা অগ্নিতে গরুর চর্বি ও মাংসখন্ডকে শূলে গেঁথে ঝলসিয়ে এক পাত্রে রান্না করা হয় এবং অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়। বৌধায়ণ গৃহ্য সূত্র ২/৭ এ শূলগবের সময় গোবলির বিধান দেওয়া হয়েছে।

কিছু লোক বলেন গোমেধের অর্থ গরুকে হত্যা করা নয় বরং গরুকে পালন করা। প্রাচীন প্রমাণগুলোর নিরিখে দেখলে একথা কপোলকল্পনার অতিরিক্ত গুরুত্ব রাখে না। যখন শতপথব্রাহ্মণে স্পষ্টভাবে পশুর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে কেটে পুরোহিত ও যজমানের মধ্যে ভাগাভাগির কথা পাওয়া যায় তখন একে গোবধ না বলে আর কি বলা যায়?

কিছু লোক বেদের এমন কিছু অংশকে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করে যেখানে গরুর সাথে 'অঘ্ন্যা' (হত্যার অযোগ্য) বিশেষণ যুক্ত আছে। এই বিশেষণ থেকে তারা এটা প্রমাণ করতে চায় যে গো হত্যা করা হত না। কিন্তু তাদের এই মত স্বীকার করা যায় না, কারণ এমন জায়গাতে শুধুমাত্র গাভী বিশেষের হত্যায় নিষেধ করা হয়েছে, সকল প্রকার গোবধের নিষেধ করা হয় নি। উদাহরণ হিসেবে নিম্নলিখিত মন্ত্র দেখা যেতে পারেঃ

দুহামশ্বিভ্যাং পয়ো অঘ্ন্যেয়ং সা বর্ধতাং মহতে সৌভগায়। (ঋগবেদ ১/১৬৪/২৭)

অর্থাৎ, "এই গাভী অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দুধ প্রদান করে। এ আমাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করুক। এ বধের যোগ্য নয়।"

---

১ নাক মুখ বন্ধ করে পশুকে হত্যা করার পদ্ধতিকে সংজ্ঞপন বলে

এখানে 'ইমং' (এই) শব্দ দ্বারা গাভী বিশেষকে বোঝানো হয়েছে। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বৈদিককোশ' এ বলা হয়েছে, 'অঘ্ন্যা' বলার পরেও গাভীদের হত্যা করা হত। ধর্মশাস্ত্রের পণ্ডিত ড. পি. ভি. কানে লিখেছেন, "এমন নয় যে বৈদিকযুগে গরু পবিত্র ছিল না। এর পবিত্রতার কারণেই বাজসনেয়ী সংহিতায়[১] গোমাংস খাওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছিল।" (ধর্মশাস্ত্র বিচার, মারাঠী, পৃষ্ঠা ১৮০)

বৈদিক যুগে গোমাংসাহার

বৈদিক যুগে গোমাংস ভক্ষণ হত বলেই স্বামী বিবেকানন্দ বৈদিক যুগকে স্বর্ণযুগ বলেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনিকার স্বামী নিখিলানন্দ লিখেছেন, "স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণদের সাহসের সাথে বলেছিলেন যে বৈদিক যুগে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল। যখন একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ভারতের ইতিহাসের কোন সময়টি স্বর্ণযুগ ছিল তখন তিনি বৈদিকযুগকে স্বর্ণযুগ বলেছিলেন, যখন পাঁচজন ব্রাহ্মণ মিলে একটা গরু কেটে খেয়ে ফেলতো।"[২]

উপনিষদেও গোমাংস খাওয়ার বিধান পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬/৪/১৮ এ লেখা আছেঃ অথ য ইচ্ছেৎপুত্রো মে পন্ডিতো বিগীতঃ সমতিংগমঃ সুশ্রুষিতাং বাচং ভষিতা জায়েত সর্বান্বেদাননুব্রবীত্ সর্বমায়ুরিয়াদিতি মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবা ঔক্ষেণ বার্ষভেণ বা।

অর্থাৎ যিনি চান তার পুত্র সভায় বাগ্মী, সর্ববেদে পারঙ্গম, শতবর্ষজীবি হোক, তার এবং তার স্ত্রীর বৃষ বা ষাঁড়ের মাংস রান্না করে ভাত এবং ঘি এর সাথে মিশিয়ে খাওয়া উচিত।

কিছু লোক উপনিষদের বৃষ এবং ষাঁড় বাচক শব্দ- ঔক্ষ, আর্ষভ এর অর্থ বদলানোর চেষ্টা করে থাকে। অনেক পুরাণপন্থী পণ্ডিতেরা এই শব্দগুলোর অর্থ ভেষজ উদ্ভিদ করেছেন কিন্তু তাদের এই ধরণের অর্থ শুধু প্রাচীন টীকাকার এবং ভাষ্যকারদের বিপরীতই নয়, হাস্যকরও বটে।

খুশির কথা হল বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপর এমন এক বিদ্বানের ভাষ্য পাওয়া যায়, যিনি ১২ থেকে ১৩ শত বৎসর পূর্বে ভারত থেকে বেদবিরোধী বুদ্ধমতকে 'সমূলে নষ্ট করার' জন্য এবং হিন্দু ধর্মকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রসিদ্ধ। তার প্রতিনিধিরা আজও ভারতের চারিদিকে হিন্দু ধর্মের সর্বোচ্চ অধিকারী রূপে বিদ্যমান। তিনি হলেন আদিশঙ্করাচার্য। তার করা অর্থ আজ অবধি সর্বজনগ্রাহ্য। সেই অর্থের

---

১ অর্থাৎ শুক্ল যজুর্বেদে

২ স্বামী নিখিলানন্দ রচিত 'বিবেকানন্দ এ বায়োগ্রাফী', পৃষ্ঠা ৯৬

ভিত্তিতে 'ঔক্ষ' এবং 'আর্ষভ' শব্দের অর্থ নিয়ে যে প্রতারণা চলছে তা আপনা আপনিই ফাঁস হয়ে যায়। শঙ্করাচার্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই বিবাদিত অংশের ভাষ্যে বলেছেনঃ মাংসমিশ্রমোদনং মাংসৌদনম্, তৎমাংসনিয়মার্থমাহ- ঔক্ষেণ বা মাংসেন। উক্ষা সেচনসমর্থঃ পুংগবস্তদীয়ং মাংসম্, ঋষভস্ততোঅপ্যধিকবয়াস্তদীয়মার্ষভং মাংসম্।[১]

অর্থাৎ, মাংসমিশ্রিত ওদন বা ভাতকে মাংসৌদন বলে। সেই মাংস কিসের হওয়া উচিত, এ বিষয়ে বলা হয়েছে- উক্ষা এর। উক্ষা এর অর্থ বীর্য সেচনে সমর্থ বৃষ। এর মাংস অথবা ঋষভের মাংস হওয়া উচিত। ঋষভ হল উক্ষার চাইতে অধিক বয়স্ক বৃষ।

শঙ্করাচার্যের ভাষ্য অর্থবদলকারীদের অর্থ বদলানোর কোনো সুযোগ অবশিষ্ট রাখে না। উপনিষদে যে বেদজ্ঞ, দীর্ঘায়ু এবং বাকপটু পুত্র আকাঙ্ক্ষাকারীদের গোমাংস খাওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না।

গৃহ্যসূত্রগুলোতে মধুপর্কের বিধান পাওয়া যায়। গৃহ্যসূত্রে উল্লেখিত মধুপর্কে গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণের উল্লেখ মেলে। গৃহ্যসূত্রগুলোতে মধুপর্ক সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা একে একে উল্লখ করা হচ্ছে।

আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রে লেখা আছে, "যখন আচার্য, বেদজ্ঞ বা স্নাতক ঘরে আসবে, তাকে মধুপর্ক দিয়ে সম্মানিত করবেন। যদি তিনি অনুমতি দেন তাহলে, 'গৌরস্যপহতপা..." ইত্যাদি মন্ত্র পড়ে তাকে হত্যা করে অতিথিকে দেবেন।" (১৩/৫/১৫-১৭)

পারস্কর গৃহ্যসূত্রে[২] লেখা আছে, "আচার্য, ঋত্বিক, বৈবাহ্য, রাজা, প্রিয়জন এবং স্নাতক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতির হোক বা সমান জাতির হোক তারা অর্ঘ্য (পূজ্য)। এদের মধ্যে কেউ বাড়িতে এলে গৃহপতির উচিত তাদের মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা সংস্কার করা। সৎকার মাংস ছাড়া করা যাবে না। এজন্য গোহত্যা করার কথা বলা হয়েছে। পূজ্য ব্যক্তির সামনে খড়্গ এবং গরু আনা হবে। অর্ঘ্য (অতিথি) যদি মাংস খান তবে হত্যা করার আজ্ঞা দেবেন। যদি তিনি নিরামিষাশী হন, তাহলে ছেড়ে দেওয়ার আজ্ঞা দেবেন। যজ্ঞ এবং বিবাহকালে ছেড়ে দেওয়ার আজ্ঞা দেওয়া উচিত নয়। ..."[৩]

তিন অথবা চার অষ্টকাশ্রাদ্ধের কোনোটিতে গোহত্যার ব্যবস্থা ছিল। (খদির গৃহ্যসূত্র ৩/৪/১ , গোভিল গৃহ্যসূত্র ৩৩/১০/১৬)

---

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬/৪/১৮ এর শঙ্করভাষ্য

২ অর্হণ প্রকার নিরূপণ

৩ দেখুন উত্তররামচরিত, চৌখম্বা প্রকাশনী, বারাণসী, ১৯৯৬ এর সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪০৬ এ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক কান্তানাথ শাস্ত্রী তৈলঙ্গ এর টিপ্পনী

কিছু লোকেরা বলে, মধুপর্কে মধু, দধি প্রভৃতি দেওয়া হত কিন্তু মাংস দেওয়া হত না, গোমাংস দেওয়া তো দূরের কথা। এ কথা গৃহ্যসূত্রে বলা কথার সম্পূর্ণ বিপরীত, কেননা মানব গৃহ্য সূত্র ১/৯/২২ এ স্পষ্ট লেখা আছে , "নামাংসো মধুপর্ক ইতি শ্রুতিঃ।" অর্থাৎ মধুপর্ক মাংস ছাড়া হতে পারে না, এমন মত বেদের।

দ্বিতীয়ত, আমাদের কাছে একটি প্রমাণ আছে, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। সেই প্রমাণ এমন এক ব্যক্তির রচনা যিনি শঙ্করাচার্যেরও আগে বা তার সময়কালে বৈদিক কর্মকাণ্ডকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা কুমারিল ভট্টের শিষ্য। তিনি হলেন ভবভূতি। ভবভূতি তার বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক 'উত্তররামচরিতম্' এর চতুর্থ অঙ্কে বিষ্কম্ভকে লিখেছেন যে, বাল্মীকির আশ্রমে যখন বশিষ্ঠ এসে উপস্থিত হন, তখন তার সৎকার দুই বৎসরের বাছুরের মাংস দ্বারা করা হয়েছিল।

এর ফলে বাল্মীকির এক শিষ্য সৌধাতকী ভীষণ রেগে যান। তিনি নিজের সহপাঠী ভান্ডায়ন কে বলেন, "এই বশিষ্ঠ কোনো বাঘ বা নেকড়েই হবেন, কারণ তিনি এসেই বেচারী কল্যাণীকে (বাছুরের নাম) চেটে খেয়ে ফেললেন।" একথা শুনে তার সহপাঠী শাস্ত্রসম্মমত উত্তর দিয়ে বলেনঃ সমাংসো মধুপর্ক ইত্যাম্নায়ং বহুমন্যমানাঃ শ্রোত্রিয়াভ্যাগতায় বৎসরীং মহোক্ষং মহাজং বা নির্বপন্তি গৃহমেধিনঃ, তং হি ধর্মসূত্রকারাঃ সমামনংতি।

অর্থাৎ, মধুপর্ক মাংস দিতে হবে, এই বেদবচনকে ভীষণ শ্রদ্ধা জানিয়ে গৃহে আগত বেদজ্ঞ অতিথির জন্য বাছুর অথবা বড় বৃষ অথবা বড় ছাগল হত্যা করা হয়। এই বেদবচনকে ধর্মসূত্র রচনাকারীরাও ভীষণ মান্য করেন।

এর ব্যাখ্যায় চন্দ্রকলা নামক সংস্কৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির এক শ্লোকার্ধ উল্লেখ করা হয়েছে- 'মহোক্ষং ব মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েত।' অর্থাৎ বড় বৃষ বা বড় ছাগল বেদের বিদ্বানের খাওয়ার জন্য যোগাড় করবেন।"[১]

এই কথাকে আরও স্পষ্ট ভাবে বশিষ্ঠ স্মৃতিতে (অধ্যায় ৪) বলা হয়েছেঃ

অথাপি ব্রাহ্মণায় বা রাজন্যায় বা অভ্যাগতায় বা,
মহোক্ষং বা মহাজং বা পচেত্ এবমস্যাতিথ্যং কুর্বন্তীতি।

অর্থাৎ, কারো গৃহে যদি ব্রাহ্মণ অথবা রাজা অতিথি হয়ে আসেন তবে তার জন্য একটি বড় বৃষ অথবা বড় ছাগল রান্না করা উচিত। এভাবে অতিথির সৎকার করা হয়।

---

১ দেখুন, 'উত্তররামচরিতম্' চন্দ্রকলা ব্যাখ্যা সহিত, চৌখম্বা প্রকাশন বারাণসী, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২০৭

মিথ্যা প্রমাণ করার অসফল প্রচেষ্টা

কিছু লোক স্মৃতিতে উল্লেখিত ‘মহোক্ষ’ অথবা ‘মহাজং’ শব্দের অর্থ ভেষজ উদ্ভিদ করেন। এর ফলে তাদের নিজের পূর্বপুরুষদের গোহত্যার ‘পাপ’ হতে মুক্ত করার বৃথা প্রচেষ্টায় মিথ্যা বলার ‘পাপ’ ছাড়া অপর কিছু হয় না, কেননা ‘বৎসরী (বাছুর), মহোক্ষ (বড় বৃষ) বা মহাজং (বড় ছাগল) শব্দগুলোর অর্থ যদি ভবভূতি ঔষধি মনে করতেন, তাহলে তা খাওয়ার ফলে বশিষ্ঠকে বাঘ বলা হত না। বাঘ কি ভেষজ উদ্ভিদ খায়?

দ্বিতীয়ত, ‘বশিষ্ঠস্মৃতি’ এর যে উদ্ধৃতি আগে দেওয়া হয়েছে তার পূর্ববর্তী শ্লোক থেকে স্পষ্ট হয় যে স্মৃতিকার ‘মহোক্ষ’ অথবা ‘মহাজ’ শব্দগুলোর অর্থ পশুবিশেষ বলে মনে করেন, ঔষধি বিশেষ বলে মনে করেন না। পূর্ববর্তী শ্লোকটি নিচে দেখুনঃ

পিতৃদেবাতিথিপূজায়াং পশুং হিংস্যাত্।
মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্মণি। যজ্ঞে বধোঅবধঃ।

অর্থাৎ, পিতৃ, দেব এবং অতিথি পূজার সময়, মধুপর্ক, যজ্ঞ , পিতৃকর্ম (শ্রাদ্ধ) এবং দেবকর্মে পশুহিংসা করবেন। যজ্ঞে করা বধ, বধ নয়।

অতএব, এই শ্লোকের পরের শ্লোকে যে ‘মহাজ’ ,’ মহোক্ষ’ শব্দ এসেছে, এগুলো দ্বারা নিঃসন্দেহে বড় ছাগল এবং বড় বৃষই বোঝায়।

আর একটি কথা, প্রাচীনকালে সংস্কৃতে অতিথি বোঝাতে গোঘ্ন শব্দ ব্যবহার করা হত। গোঘ্ন এর অর্থ- গো হত্যাকারী। কিন্তু এর পারিভাষিক অর্থ হল, যার জন্য গো হত্যা করা হয়। এই শব্দ হতে এটাই প্রকাশ পায় যে, অতিথির জন্য গো হত্যা করা হত। অতিথির সাথে গোবধের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সরাসরি সম্পর্ক থাকার জন্য, অতিথির জন্য গোঘ্ন শব্দ প্রচলিত হয়ে পড়েছিল।

আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, শ্রাদ্ধে গোমাংস দেওয়া হলে পিতৃরা এক বছর অবধি তৃপ্ত থাকেন। বিভিন্ন মাংসে পিতৃদের বিভিন্ন সময় তৃপ্ত থাকার প্রসঙ্গে আপস্তম্ভ লিখেছেনঃ “সংবৎসরং গব্যেত প্রীতিঃ, ভুয়াংসমতো মাহিষেণ, এতেন গ্রাম্যারণ্যানাং পশুনাং মাংসং মেধ্যং ব্যাখ্যাতম্। খড্গোপস্তরণে খড্গমাংসেনানন্ত্যং কালম্। তথা শতবলের্মৎস্যস্য মাংসেন বাধ্রীণসস্য চ।“ (আপস্তম্ভ ধর্ম সূত্র ২/৭/১৬/২৫ এবং ২/৭/১৭/৩)

অর্থাৎ, শ্রাদ্ধে গোমাংস খাওয়ালে পিতৃরা এক বর্ষ অবধি সন্তুষ্ট থাকেন। মহিষের মাংস খাওয়ালে তার অধিক সময় সন্তুষ্ট থাকেন। এই নিয়মই খরগোশ প্রভৃতি বন্য পশু এবং ছাগল প্রভৃতি গ্রামীণ পশুর মাংসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি গণ্ডারের চামড়ায় ব্রাহ্মণদের বসিয়ে গণ্ডারের মাংস খাওয়ানো হয় , তাহলে পিতৃরা অনন্তকাল সন্তুষ্ট থাকেন। শতবলি নামক মাছের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

অনেকটা একইধরণের কথা মহাভারতে (অনুশাসন পর্ব ৮৮/৫) পাওয়া যায়ঃ গব্যেত দন্তং শ্রাদ্ধে তু সংবৎসরমিহোব্যতে।

অর্থাৎ, গোমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে পিতৃরা এক বৎসর অবধি তৃপ্ত থাকেন।

পুরাণ এবং স্মৃতিতে লেখা আছে শ্রাদ্ধে দেওয়া মাংস যে না খায়, সে নরকে গমন করে।

মনু (৫/৩৫) লিখেছেনঃ

নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ।
স প্রেত্য পশুনাং যাতি সংভবানেকবিংশতিম্।।

অর্থাৎ, যে শ্রাদ্ধ এবং মধুপর্কে পরিবেশিত মাংস খায় না, সে মৃত্যুর পর একুশ জন্ম অবধি পশু হয়ে জন্মায়। যজ্ঞ এবং শ্রাদ্ধে যে দ্বিজ মাংস খায় না, সে পতিত হয়।

এমন কথা কূর্ম পুরাণেও (২/১৭/৪০) বলা হয়েছে। বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ (১/৪০/৪৯-৫০) এ বলা হয়েছে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে খেতে বসে পক্তিতে পরিবেশন করা মাংস খায় না, সে নরকে যায়।[১]

মহাভারতে গোমাংস দিয়ে হবন করে রাজ্য নষ্ট করার কথা বলা আছে। দাল্ভ্যের কাহিনীতে আছেঃ

যদৃচ্ছয়া মৃতা দৃষ্টা গাস্তদা নৃপসত্তমঃ।৮
এতান্ পশুন্ নয় ক্ষিপ্রং ব্রহ্মবংধৌ যদীচ্ছসি।৯
স তুৎকৃত্য মৃতানাং বৈ মাংসানি মুনিসত্তমঃ।১১
জুহাব ধৃতরাষ্ট্রস্য রাষ্ট্রং নরপতেঃ পুরা।
অবকীর্ণে সরস্বত্যাস্তীর্থ প্রজ্বাল্য পাবকম্। ১২
বকো দাল্ভো মহারাজ নিয়মং পরমং স্থিতঃ।

১ দেখুন, ধর্মশাস্ত্রো কি ইতিহাস , খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১২৪৪

স তৈরেব জুহাবাস্য রাষ্ট্রং মাংসৈর্মহাতপাঃ।। ১৩
তস্মিংস্তু বিধিবত্ সত্রে সংপ্রবৃত্তে সুদারুণে।
অক্ষীয়ত ততো রাষ্ট্রং ধৃতরাষ্ট্রস্য পার্থিব।।১৪

অর্থাৎ, এই মৃত গরুগুলোকে যদি নিয়ে যেতে চাও , তবে নিয়ে যাও। দাল্ভ্য এই মৃত গরুদের মাংস কেটে সরস্বতীর তীরে অবকীর্ণ নামক তীর্থস্থলে অগ্নি জ্বালিয়ে হবন করেছিলেন। বিধিপূর্বক যজ্ঞ সম্পন্ন হলে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষীণ হয়েছিল।

শান্তিপর্বে আছে, ছিন্ন বৃক্ষের মত ছিন্ন বৃষদের যজ্ঞে দেখে এবং গরুদের বিলাপ শুনে রাজা বিচুখ্য বিচলিত হয়েছিলেন এবং তাদের প্রতি দয়া দেখিয়ে বলেছিলেন- তাদের কল্যাণ হোক।

ছিন্নস্থূণং বৃষং দৃষ্ট্বা বিলাপং চ গবাং ভৃশম্।
গোগ্রহে যজ্ঞবাটস্য প্রেক্ষমাণঃ স পার্থিবঃ।। ২
স্বস্তি গোভ্যোঅস্তু লোকে ততো নির্বচনং কৃতম্।৩
-অধ্যায় ২৬৫

মহাভারতে রন্তিদেব নামে এক রাজার কথা পাওয়া যায়। তিনি গোমাংস পরিবেশন করে যশস্বী হয়েছিলেন। মহাভারতের বনপর্বে (অধ্যায় ২০৮ অথবা ১৯৯) আছেঃ

রাজ্ঞো মহানসে পূর্বং রন্তিদেবস্য বৈ দ্বিজ।
দ্বে সহস্রে তু বধ্যেতে পশুনামন্বহং তদা।
অহন্যহনি বধ্যেতে দ্বে সহস্রে গবাং তথা...
সমাংসং দদতো হ্যন্নং রন্তিদেবস্য নিত্যশঃ।
অতুলা কীর্তরভবন্নৃপস্য দ্বিজসত্তম।
-মহাভারত , বনপর্ব, ২০৮, ১৯৯/৮-১০

অর্থাৎ, রাজা রন্তিদেবের রান্নাঘরের জন্য প্রতিদিন দুই হাজার পশু হত্যা করা হত। মাংসসহ অন্ন দান করে রন্তিদেব অতুল কীর্তি লাভ করেছিলেন।

এই বর্ণনা পড়ে যেকোনো ব্যক্তি বুঝতে পারেন, গোমাংস দান করার ফলে রন্তিদেবের যেহেতু অতুল কীর্তি হয়েছিল সুতরাং গোহত্যা প্রশংসনীয় কার্য হিসেবে বিবেচিত হত, নিন্দনীয় কার্য হিসেবে নয়।

আরও এক কৌশল

যেসব লোকেরা আজ ধর্মগ্রন্থের অনেক স্থানের অর্থ কোনো না কোনো ভাবে বদলাতে চেষ্টা করছেন, তারা পূর্বোক্ত শ্লোকের অর্থ বদলাতে সক্ষম হন না। এই কারণেই তারা এই স্থানের বিরোধীতা করার জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন করেছেন। তারা বলেন, এই শ্লোক সব প্রতিলিপিতে নেই, সুতরাং বিধর্মীরা এটাকে প্রক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু তাদের এই কথা সঠিক নয়, কারণ এই শ্লোকগুলো ক্রিটিকাল এডিশনেও আছে। উদাহরণস্বরূপ, উপরোক্ত শ্লোকটি চিত্রকলা সংস্করণ এর ২০৮ তম অধ্যায়ে আছে এবং ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর সংস্করণের ১৯৯ তম অধ্যায়ে আছে, ভারতীয় বিদ্যা ভবন মুম্বাই এর প্রসিদ্ধ প্রকাশন 'দ্যা হিস্ট্রি এন্ড কালচার অফ দি ইন্ডিয়ান পীপল' এও আছে, যার মুখ্য সম্পাদক ছিলেন আর. সি. মজুমাদার এবং এতে এই শ্লোকগুলোর বৈধতা স্বীকার করা হয়েছে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে লেখা আছেঃ "মহাভারতে আছে রাজা রন্তিদেব লোকজনকে মাংস দান করার জন্য প্রতিদিন দুই হাজার সাধারণ পশু হত্যা করতেন এবং দুই হাজার গরু হত্যা করতেন।" (পৃষ্ঠা ৫৭৯)

দ্বিতীয়ত, রন্তিদেবের উল্লেখ মহাভারতের অন্যত্রও রয়েছে। শান্তি পর্বের ২৯ তম অধ্যায়ের ১২৩ তম শ্লোকে আছে, রাজা রন্তিদেব যে গরুদের বলি দিয়েছিলেন তাদের রক্তে এক মহানদীর উৎপত্তি হয়েছিল। সেই নদীর নাম হয়েছিল চর্মণ্বতী।

মহানদী চর্মরাশোরুৎক্লেদাত্ সংসজে যতঃ।
ততশ্চর্মণ্বতীত্যেবং বিখ্যাতা সা মহানদী।।

কিছু লোক এই সহজ সরল শ্লোকের অর্থও বদলানোর চেষ্টা করেন। তারা বলেন, "জীবিত গরু দান করার সময় তাদের গায়ে ছেটানো জল থেকে চর্মণ্বতী নদীর উৎপত্তি হয়েছিল।"

এই কপোলকল্পিত অর্থকে হয়তোবা কেউ স্বীকার করে নিত যদি না কালিদাসের প্রসিদ্ধ 'মেঘদূত' আমাদের কাছে থাকতো। মেঘদূতের এক স্থানে কালিদাস লিখেছেনঃ

ব্যালংবেথাঃ সুরভিতনয়াঅঅলম্ভজাং মানয়িষ্যন্।
স্রোতোমূর্ত্যো ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্তিম্।।

এই পদ্যটি পূর্বমেঘে রয়েছে। অনেক সংস্করণে এটা ৪৫ নং শ্লোকে এবং অনেক সংস্করণে ৪৮ বা ৪৯ নং শ্লোকে আছে। এর অর্থ হল, "হে মেঘ, তুমি গরুদের আলম্ভনের (হত্যার) ফলে পৃথিবীতে নদীরূপে বয়ে চলা রন্তিদেবের কীর্তিতে অবশ্যই ঝুঁকো।

এখানে স্পষ্টভাবে গরুদের আলম্ভনের (হত্যার) ফলে নদীর প্রবাহিত হওয়ার উল্লেখ আছে। কিছু লোকেরা এখানেও বলতে পারে, আলম্ভনের অর্থ হত্যা করা নয়। তাদের 'মেঘদূত' এর প্রাচীন টীকাকার[১] মল্লিনাথের এই স্থানের টীকা দেখা উচিত। মল্লিনাথ লিখেছেন, "পুরা কিল রাজ্ঞো রন্তিদেবস্য গবালম্ভভেম্বেকত্র সম্ভৃতাদ্ রক্তনিষ্যংদাচ্চর্মরাশোঃ কাচিন্নদী সস্যন্দে। সা চর্মণ্বতীত্যাখ্যায়ত ইতি।"

অর্থাৎ, প্রাচীন কালে রাজা রন্তিদেব গরুদের আলম্ভ (হত্যা) করেছিলেন। তার ফলে একত্র করা চামড়া থেকে প্রবাহিত হওয়া রক্ত নদীর মত বয়ে চলেছিল। সেই রক্তের নদী চর্ম থেকে প্রবাহিত হয়েছিল, তাই তার নাম চর্মণ্বতী হয়েছিল।

মহাভারতের অন্যত্রও রন্তিদেবের প্রসঙ্গে 'আলম্ভ' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। সেখানে আছে, এক দিন রাজা রন্তিদেবের গৃহে অনেক অতিথি এলে তিনি ২০১০০ গরু হত্যা করেছিলেনঃ

সাংকৃতে রন্তিদেবস্য যাং রাত্রিমবসন্ গৃহে।
আলম্ভ্যংত শতং গবাং সহস্রাণি চৈক বিংশতিঃ।।
-শান্তি পর্ব ২৯/১২৭

কিন্তু অর্থ বদলানোয় তৎপর ধর্মরক্ষকেরা 'আলম্ভ' শব্দের অর্থ বদলিয়ে বলেন, আলম্ভ শব্দের অর্থ- "হাত দিয়ে ছুয়ে দান করা, হত্যা করা নয়"। এই অর্থ স্বীকার করা যেত, যদি না ধর্মশাস্ত্রে একটি বিশেষ শ্লোক পাওয়া যেত। যেহেতু সেই শ্লোকটি পাওয়া যায় এবং এর অর্থ সকলেই একই রকম করেন, তাই কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই 'ছুঁয়ে দান করা' এই অর্থ স্বীকার করতে পারেন না। পরবর্তী কালে রচিত স্মৃতিতে সেই শ্লোক পাওয়া যায়। এগুলোতে অনেক আচার অনুষ্ঠানকে কলিযুগে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আপস্তম্ভ কল্পসূত্র পুরাণে বলা হয়েছেঃ

অশ্বালম্ভং গবালম্ভং সন্ন্যাংসং পলপৈতৃকম্।
দেবরাচ্চ সূতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েত্।।

অর্থাৎ, "অশ্বের আলম্ভ, গরুর আলম্ভ, সন্ন্যাস, শ্রাদ্ধে মাংস পরিবেশন, দেবর এর নিয়োগ দ্বারা পুত্র উৎপাদন – এই পাঁচটি কলিযুগে করবেন না।"

এই শ্লোকটি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডেও (অধ্যায় ১১৫/১১২-১৩) পাওয়া যায়।

---

১ প্রায় ১৪ শতাব্দীর

ধর্মগ্রন্থে হত্যা প্রসঙ্গে

এই শ্লোকটি সংস্কৃতের এক প্রাচীন শব্দকোষ 'শব্দকল্পদ্রুম' এ উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং 'আলম্ভ' শব্দের অর্থ 'হত্যা করা' বলা হয়েছে এবং তার সাথে আর এক প্রাচীন কোশ 'অমর কোশ' এর তথ্যসূত্র দেওয়া হয়েছে।

কলিযুগে এই পাঁচটি নিষিদ্ধ করার কারণ হল, পরবর্তীকালে এদের আপত্তিজনক বলে মনে করা হত। যদি এখানে 'গবালম্ভ' এর অর্থ 'গরুকে হত্যা করা' না হয়ে 'ছুঁয়ে দান করা' হত তাহলে একে কলিযুগে নিষিদ্ধ করা হত না, কেননা গোদানের বিধান তো ধর্মগ্রন্থে অহরহ পাওয়া যায় এবং সেই দান তো নিজের হাতেই করা হয়। গরু দানকারী নিজের হাত দিয়ে ব্রাহ্মণকে গরু দান করেন।

অন্য একটি গ্রন্থ, 'বৃহন্নারদীয়' তে লেখা আছেঃ

... মধুপর্কে পশোর্বধঃ মাংসৌদনং তথা শ্রাদ্ধে।
নরমেধাশ্বমেধকৌ... গোমেধং মখং তথা।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুঃ মনীষিণঃ।।

অর্থাৎ, মধুপর্কে পশুহত্যা, শ্রাদ্ধে মাংস এবং ভাত দেওয়া, নরমেধ, অশ্বমেধ এবং গোমেধ মখ (যজ্ঞ) করা- এগুলো কলিযুগে বর্জন করা উচিত।

এখানে 'গোমেধ' মখকে কলিযুগে বর্জন করতে লেখা হয়েছে। 'মেধ' এর অর্থ- হিংসা বা বধ। এটা হিংসাবাচক মেধ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। গোমেধ এর অর্থ হল গরু হত্যা। 'গোমেধ মখ ' এর অর্থ হল- এমন যজ্ঞ যেখানে গরুকে হত্যা করা হয়। স্পষ্টতই ; 'গবালম্ভ' এর অর্থ হল – গরুদের হত্যা করা। এই গোহত্যার কারণেই কলিযুগে গবালম্ভ বা গোমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হিন্দু গ্রন্থে যেমন গোহত্যার কথা পাওয়া যায়, তেমনি বৌদ্ধ গ্রন্থেও তা পাওয়া যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থের এমন স্থানের কথা নিচে বলা হচ্ছেঃ

এক নির্গ্রন্থ (জৈন) সাধু হয়েছিলেন। সেই সাধু গরু, বাছুর এবং গাভীকে হত্যা করে খেয়ে ফেলেছিলেন। (তিত্তিরজাতক, পৃষ্ঠা ৪৩৮)

জাতক যুগের হত্যাকারী

বৃষের হত্যা করে যজ্ঞ করার উল্লেখ বৌদ্ধ সাহিত্যেও পাওয়া যায়। বেদের পরম বিদ্বান এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বনে এক কুটীর নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে অগ্নি স্থাপন করে, বৃষ হত্যা করে তার মাংসে আহুতি দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন। কিছু শিকারী এসে ব্রাহ্মণের অনুপস্থিতে বৃষটিকে হত্যা করে খেয়ে ফেললো। ব্রাহ্মণটি লবণ আনার জন্য গ্রামের দিকে গিয়েছিলেন। বৃষ হত্যা করে খাওয়ার জন্য তার লবণ জোগাড় করা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। তার এই ইচ্ছাও পূর্ণ হল না। (নটজুট্ঠজাতক, পৃষ্ঠা ১৪৪)

বৃষের হত্যা করে অগ্নির পূজা করা কোনো বিচিত্র ব্যাপার ছিল না। যেখানে ফল, মূল, অন্নের চাইতেও মাংস সস্তা এবং সবাই মাংস আহার করে, সেখানে বৃষ, গাভী, শুকর প্রভৃতির বিশেষ কোনো মাহাত্ম্য থাকে না।

'জাতক কালীন ভারতীয় সংস্কৃতি'র লেখকের মত হল, "জাতক কথায় বৃষ, গাভী হত্যাকারীরা ব্রাহ্মণই ছিলেন। একজন ক্ষত্রিয়ও পূজার জন্য বা খাওয়ার জন্য বৃষ বা গাভীকে হত্যা করেননি, বৈশ্যরাও নয়, শূদ্র অথবা চণ্ডালেরাও নয়। ব্রাহ্মণ বর্ণই ছিল জাতকযুগের গোহত্যাকারী।" (পৃষ্ঠা ২১৬)

বেদ, ব্রাহ্মণগ্রন্থ, উপনিষদ, গৃহ্যসূত্র, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি থেকে উপরে যে প্রমাণগুলো দেওয়া হয়েছে তা থেকে এই ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, প্রাচীন ভারতে গোহত্যা এবং গোমাংসাহার প্রচলিত ছিল।

কিন্তু হিন্দু ধর্মে আজ এই দুটিকে মহাপাপ বলে মনে করা হয়। এমনটা কেন হল এবং কবে থেকে হল, মনে এই প্রশ্ন জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর এর উত্তরও খুবই সরল। ড. ভীমরাও আম্বেদকর তার গবেষণাগ্রন্থ 'The Untouchables' (পৃষ্ঠা ১৪৮-১৫৪) এ বিষদে এই প্রশ্নের বিচার করেছেন। তিনি লিখেছেন, এটা ব্রাহ্মণদের যুদ্ধনীতির একটা কৌশল ছিল যার মাধ্যমে তারা গোহত্যাকারী থেকে গোপূজক হয়ে গিয়েছিল। গোহত্যা বন্ধের রহস্যের সমাধান ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধদের মধ্যে চলা ৪০০ বছরের সংঘর্ষ এবং কৌশলে খুঁজতে হবে, যা ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের পরাজিত করার জন্য অবলম্বন করেছিল। যজ্ঞে গোহত্যার বিরোধীতা করে বৌদ্ধরা জনসাধারণের মনে স্থান করে নিয়েছিল। তাদের পরাজিত করার একটাই উপায় ছিল, তা হল তাদের চাইতে এক ধাপ এগিয়ে

গিয়ে নিরামিষাশী হয়ে যাওয়া। ব্রাহ্মণেরা নিরামিষাশী হয়েছিল এবং জিতেছিল। এর প্রমাণ হল, গোহত্যা গুপ্ত রাজাদের আমলে অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

শ্রী ভাণ্ডারকর বলেছেন, "আমাদের কাছে এই কথার শিলালেখ হতে প্রাপ্ত অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যে, পঞ্চম শতাব্দীতে গোহত্যা ভয়ানক পাপ বলে ঘোষিত হয়েছিল। এর সর্বপ্রথম উল্লেখ গুপ্তরাজা স্কন্দগুপ্তের ৪৬৫ খ্রিস্টাব্দের তাম্রপত্রে রয়েছে।"[১] এই সময়ের আগের ধর্মশাস্ত্রে গোহত্যা অপরাধ ছিল না। এজন্য বশিষ্ঠ বলেছিলেনঃ ধেন্বনড্বাহৌ মেধ্যৌ বাজসনেয়নে। অর্থাৎ, বাজসনেয়ের (যজুর্বেদীদের) মতে বৃষ এবং গাভী মেধ্য অর্থাৎ ভক্ষণযোগ্য।

একইভাবে, মনুসংহিতা ৫/১৮ এ এক পাটি দাঁত বিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে কেবল উটকে অভক্ষ্য বলা হয়েছে- উষ্ট্রোংশ্চৈকতোদতঃ। এখানে গরুকে অভক্ষণযোগ্য বলা হয়নি বরং মনুস্মৃতির অনেক প্রাচীন ব্যাখ্যাকার স্পষ্টভাবেই গরুকে ভক্ষণযোগ্য বলেছেন। মনুসংহিতার প্রাপ্ত ভাষ্যগুলোর মধ্যে মেধাতিথির ভাষ্য প্রাচীনতম। তিনি লিখেছেনঃ উষ্ট্রবর্জিতা একতো দতো গোঅব্যজমৃগা ভক্ষ্যাঃ।[২] অর্থাৎ, উটকে ছেড়ে এক পাটি দাঁত বিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে গরু, ভেড়া, ছাগল এবং মৃগ ভক্ষণযোগ্য। আরও এক ব্যাখ্যাকার রাঘবানন্দ লিখেছেনঃ একতো দতঃ একপংক্তিদন্তযুক্তান্ গবাদীন্।[৩] অর্থাৎ এক পাটি দাঁত বিশিষ্টদের মধ্যে গরু প্রভৃতি খাওয়া যায়। মনুস্মৃতি ৩/৩ এ গরু দিয়ে তৈরি মধুপর্ক দ্বারা পূজন করার কথা বলা হয়েছেঃ তং... অর্হয়েৎপ্রথমং গবা অর্থাৎ গরু দ্বারা প্রথমে তার পূজা করবেন। এর ভাষ্যে প্রাচীন ভাষ্যকার কুল্লুকভট্ট[৪] লিখেছেনঃ গোসাধনমধুপর্কেণ পূজয়েত্। অর্থাৎ, গরু দিয়ে তৈরি মধুপর্ক দ্বারা তার পূজা করবেন।

পণ্ডিতেরা দ্বিতীয় শতাব্দীর কাছাকাছি সময়কে মনুস্মৃতির রচনাকাল বলে মনে করেন। এর পর ধীরে ধীরে গোহত্যায় পাপের ধারণা তৈরি হয়। এর প্রমাণ হল মনুসংহিতায় যে ছোটোখাটো অপরাধের[৫] সূচি দেওয়া হয়েছে, তাতে গোহত্যাও রয়েছে। এই শ্লোক অকারণে করা গোহত্যা সম্বন্ধে প্রযোজ্য হবে কারণ মনু একপাটি দাঁতযুক্ত পশুদের মধ্যে কেবল উটকে ভোজনের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন এবং অন্যান্য বাকি পশুদের ভক্ষণের যোগ্য বলেছেন।

পঞ্চম শতাব্দীর আগে

---

১ some aspects of ancient culture, 1940, পৃষ্ঠা ৭৮
২ মনুস্মৃতি ৫/১৮ এর মেধাতিথির ভাষ্য
৩ মনুস্মৃতি ৫/১৮ এর রাঘবানন্দ এর টীকা
৪ ১১৫০-১৩০০
৫ উপপাতকের

এখানে উল্লেখ করা উচিত হবে যে মনু (১১/৫৪) বড় পাপের[১] তালিকাও দিয়েছেন কিন্তু সেই তালিকায় গোহত্যা নেই। মনু ছাড়াও আপস্তম্ভ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকারেরাও গোহত্যাকে উপপাতক বলেছেন। প্রায় পঞ্চম শতাব্দী থেকে গুরুহত্যা এবং ব্রাহ্মণহত্যার মত গোহত্যাকে মহাপাপ বানানো হয়েছিল।

এখানে একটি মজাদার বিষয় উল্লেখ করা যাক, পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি গোহত্যাকে মহাপাপ বানানো হলেও, এই সময়ের পরে রচিত পুরাণে গোহত্যা এবং গোমাংসভক্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই লেখকেরা বেদ থেকে শুরু পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে রচিত গ্রন্থসমূহ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, অথবা বর্ণিত কাহিনী বা বিধানগুলো পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বের হওয়ার কারণে তারা তার বর্ণনা করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বিষ্ণু পুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের নিম্নলিখিত স্থানগুলো দেখা যেতে পারেঃ

হবিষ্যমৎস্যমাংসৈস্তু শশস্য নকুলস্য চ।।
সৌকরচ্ছাগলৈণেয়রৌরবৈর্গব্যতে চ।
ঔরভ্রগবৈশ্চ তথা মাংসবৃদ্ধ্য়া পিতামহাঃ।।
প্রয়ান্তি তৃপ্তিং মাংসৈস্তু নিত্যং বাধ্রীণসামিষৈঃ।।
-বিষ্ণুপুরাণ ৩/১৬/১-২

অর্থাৎ, হবি,[২] মৎস্য, শশক,[৩] নকুল, শুকর, ছাগল, কস্তূরী মৃগ, কৃষ্ণ মৃগ, গবয় (বন গরু), এবং গরুর মাংসে পিতৃরা ক্রমান্বয়ে এক এক মাস অধিক সন্তুষ্ট থাকেন এবং গণ্ডারের মাংসে পিতৃরা চিরকাল সন্তুষ্ট থাকেন।

পঞ্চকোটি গবাং মাংসং সাপূপং স্বান্নমেব চ।
এতেষাং চ নদী রাশি ভুঞ্জতে ব্রাহ্মণান্মুনে।।
- ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৬১

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণেরা পাঁচ কোটি গরুর মাংস এবং মালপুয়া খেয়ে ফেললেন।

প্রকৃতি খণ্ডে মহাদেব সুযজ্ঞ নামের এক রাজার বর্ণনা করেন যার রাজ্যে ব্রাহ্মণদের নিত্য সুপক্ক মাংস প্রদান করা হতঃ সুপক্কানি চ মাংসানি ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ পার্বতি। (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ৫০/১৩)

রুক্মিণীর ভাই রুক্মী তার বোনের বিবাহের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

১ মহাপাতক
২ হবনের সময় দেওয়া আহুতি দ্রব্য
৩ খরগোস

গবাং লক্ষং ছেদনং চ হরিণানাং দ্বিলক্ষকম্।
চতুরলক্ষম্ শশানাং চ কূর্মাণাং চ তথা কুরু।। (৬১)
দশলক্ষং ছাগলাতাং ভেটানাং তচ্চতুর্গুণম্।। (৬২)
এতেষাং পক্বং মাংসং চ ভোজনার্থ চ কারয়।। (৬৩)
-ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, উত্তরার্ধ, অধ্যায় ১০৫

অর্থাৎ, এক লাখ গরু, দুই লাখ হরিণ, চার লাখ খরগোশ এবং চার লাখ কচ্ছপ, দশ লাখ ছাগল এবং তার চারগুণ ভেড়া এইসব পশুদের মাংস রান্না করে ভোজন তৈরি করান।

আদিমনুর এক যজ্ঞের বর্ণনা দিতে দিয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ লিখেছেঃ

ব্রাহ্মণানাং ত্রিকোটীংশ্চ ভোজয়ামাস নিত্যশঃ।
পঞ্চলক্ষগবাং মাংসৈঃ সুপক্কৈর্ঘৃতসংস্কৃতৈঃ।
চর্ব্যৈশ্চৌষ্যৈর্লেহ্যপেয়ৌর্মিষ্টদ্রব্যৈঃ সুদুর্লভৈঃ।
-প্রকৃতি খণ্ড, ৫৪/৪৮-৪৯

অর্থাৎ, মনু যজ্ঞে তিন কোটি ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতেন। তাদের ঘিয়ে রান্না করা এবং ভালো ভাবে রান্না করা পাঁচ লাখ গরুর মাংস এবং অন্যান্য চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় দুর্লভ খাদ্য পরিবেশন করা হত।

অনেক লোক বলেন, আপনি যেসব প্রমাণ দেখিয়েছেন, তার সবই ঠিকই আছে, আমাদের গ্রন্থের সাথেও মেলে, কিন্তু বামমার্গীরা পরবর্তীকালে এসব মিশিয়েছিল।

এই কথাকে সঠিক বলে মানা যায় না, কারণ শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতেই নয় বরং কয়েক শতাব্দী আগেও পরম্পরাগত ভাবে গুরুমুখেই শিক্ষা লাভ করতো মানুষেরা, ছাপাখানা ছিল না তখন। আর গ্রন্থগুলো গুরুদের আশ্রমে বা রাজাদের পুস্তকালয়ে থাকতো। কোনো পুস্তকের একটি প্রতিলিপি পেতেও অনেক কষ্ট করতে হত। এমতাবস্থায় কোনো গ্রন্থের প্রতিটি প্রতিলিপিতে তথাকথিত বামমার্গীরা কিভাবে গোহত্যা এবং গোমাংসভক্ষণের শ্লোক, কাহিনী এবং অধ্যায় মেশালো?

দ্বিতীয়ত, প্রাচীন টীকাকার ও ভাষ্যকারেরা তো নির্বিকারচিত্তে এই সকল স্থানের উপর তাদের ব্যাখ্যা লিখেছেন এবং এগুলোকে কেউই প্রক্ষীপ্ত বা ধর্মবিরুদ্ধ বলেননি। এর বিপরীতে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ অবধি স্বামী বিবেকানন্দের মত প্রবল হিন্দু ধর্ম

প্রচারকেরা এর সমর্থন করে গিয়েছেন।তাহলে হয় এটা মনে করতে হবে যে, কোনো কালে ভারতের সকলেই বামমার্গী হয়ে গিয়েছিল এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা নিজেরাই নিজেদের গ্রন্থে পরিবর্তন করেছিলেন অথবা এটা মানতে হবে যে, স্বামী বিবেকানন্দ সহ অন্যান্য অনেক টীকাকার এবং ভাষ্যকার ধর্মগুরু এবং ধর্মপ্রবর্তকেরা বামমার্গী ছিলেন।

যদি প্রথম বিকল্পকে মানা হয়, তাহলে স্বীকার করা হয় যে, আমাদের বর্তমান হিন্দু ধর্ম আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিরোধী। এমনটি হলে আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ত্যাগ করতে হবে। যদি দ্বিতীয় বিকল্প মানা হয়, তাহলে আমাদের শংকরাচার্য, বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্মাচার্য এবং তাদের রচনাবলিকে অস্বীকার করতে হবে। কিন্তু তখন কি হিন্দু ধর্ম নামে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে?

তৃতীয় বিকল্পটি অধিক যৌক্তিক। সেটি হল, গোহত্যা এবং গোমাংসভক্ষণ ঐতিহাসিক ভাবে সত্য এবং বৌদ্ধদের সাথে সংঘর্ষের সময় সামরিক নীতি হিসাবে ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ে এতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এটা মেনে নেওয়া। তখন তো ব্রাহ্মণ্যবাদ জিতে গিয়েছিল। কিন্তু যখন গরুকে সামরিক নীতি হিসাবে আক্রমণকারীরা (মুসলমানেরা) ব্যবহার করেছিল, যেমনটা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, তখন দেশ পরাধীন হয়ে গিয়েছিল এবং গোহত্যায় নিষেধাজ্ঞা দেশের দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমানে গোহত্যার প্রচলন করা উচিত নাকি নিষিদ্ধ করা উচিত, বর্তমান পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে এর পুনর্বিচার হওয়া উচিত। এই সমস্যাটি নিয়ে রাজনৈতিক নেতারা যাতে রাজনীতি না করতে পারে, সাম্প্রদায়িকতার আগুন না জ্বালাতে পারে সেই দিকে আমাদের খেয়াল রাখা উচিত।

আলোচনা এবং আপত্তির উত্তর

'প্রাচীন ভারতে গোহত্যা এবং গোমাংসাহার' শীর্ষক লেখায় পাঠকেরা ব্যাপক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। একজন আলোচক, যার নাম দেখে স্বামী বলে মনে হয়, তিনি এই লেখাটিকে 'নিরাধার, অনর্থক এবং অমান্য' বলেছেন। তার বিচারে 'গবেষকের দৃষ্টিতে এটা খুবই নিম্নমানের লেখা।'

এক জায়গায় উনি লিখেছেনঃ ঋগ্বেদ/ যজুর্বেদ/ অধ্যায় ৭, সুক্ত, ১০৪, মন্ত্র ২ এ তিনি (বেদ) স্বয়ং মাংসভক্ষণকারীদের কিভাবে শত্রু মেনেছেন দেখুন-

"ইন্দসোমা সমধশসভ্যদ্যং তপুর্যমস্ত চরুরগ্নিবাং ইব।
ব্রক্ষদ্বিষে ক্রুব্যাদে ঘোরচক্ষসে দ্বেষো ধত্তমনবায়ং কিমীদিনে।

অর্থাৎ, হে ইন্দ্র, তুমি রাক্ষসদের বশীভূত করো। তুমি অগ্নিতে পড়া চরুর মত ভস্ম করে দাও। তুমি এমন করো যাতে ব্রাহ্মণদ্বেষী, মাংসাহারী, কটূ ভাষী, বক্রদৃষ্টি সম্পন্ন রাক্ষসদের সাথে সবসময় শত্রুতা থাকে।"

এটা পড়ে বোঝা যায় যে পত্রলেখক এই মন্ত্রটি অন্যান্য পরান্নভোজী এবং আধ্যাত্মবাদের নামে ধর্মভীরদের শোষণ করা কিছু স্বামীদের মত কারো লেখা থেকে টুকেছেন, তিনি বেদ পড়েননি। যদি তিনি নিজে বেদ পড়তেন তবে তিনি জানতেন যে, যজুর্বেদে অধ্যায়, সুক্ত এবং মন্ত্র হয় না। যদি ঋগ্বেদের কথা বলা হয়, তাতে অষ্টক (মণ্ডল), সুক্ত এবং মন্ত্র আছে, আর ঋগ্বেদের ৭ম অষ্টকে উপরোক্ত মন্ত্রটি নেই। এই মন্ত্রটি ৭ম মণ্ডলে রয়েছে।

যে ব্যক্তি জানে না যে কোনো মন্ত্র ঋগ্বেদের নাকি যজুর্বেদের, যে বেদের ঠিকভাবে তথ্যসূত্রও দিতে পারে না, সে কিভাবে বেদ জ্ঞাতা হতে পারে? কিছু মুখস্ত মন্ত্র[১] বা শ্লোক বেদশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ধর্মভীরু জনতার সামনে বলে নিজেকে অথবা ধর্মভীরুদের ধোঁকা দেওয়া যায়, কিন্তু বিদ্বানদের দেওয়া যায় না।

উপরোল্লিখিত মন্ত্রের অর্থ লেখার পর সমালোচক জিজ্ঞেস করেছেন, "এই মন্ত্র থেকে মাংস ভক্ষণকারীদের প্রতি নিন্দা কি স্পষ্ট নয়?"

এই মহাশয় আমাকে বলেছেন, আমি যাতে এর সঠিক অনুবাদ করি। এর সঠিক অনুবাদ করার আগে এই নিবেদন করছি, আগে বেদমন্ত্র শুদ্ধভাবে লিখতে শেখা উচিত, তখন শুদ্ধ অর্থ করা যেতে পারে। ইনি যে বেদমন্ত্র লিখেছেন তার প্রথম পঙক্তিতে অনেকগুলো ভুল রয়েছে। প্রথম পঙক্তিটি হলঃ "ইন্দ্রাসোমা সমধশংসমভ্যধং তপর্যুযস্তু চরুরগ্নিবাং ইব" ইনি লিখেছেন এরকমঃ "ইন্দসোমা সমধশসম্ভ্যদ্যং তপুর্যমস্তু চরুগ্নিবাং ইব।" এক পঙক্তিতে এতগুলো ভুল করা লোক বেদের সঠিক অর্থ কিভাবে জানতে পারেন?

এই মন্ত্রে একা ইন্দ্রের স্তুতি করা হয় নি, তার সাথে সোম দেবতারও স্তুতি করা হয়েছে, এখানে 'ক্রব্যাদ' এর নিন্দা করা হয়েছে, মাংসাহারীর নয়। 'ক্রব্যাদ' এর অর্থ- যে কাঁচা মাংস খায়। 'ক্রব্য' এর অর্থ কাঁচা মাংস[২]। এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী এবং কাঁচা মাংস খেকো রাক্ষসদের নিন্দা করা হয়েছে, অন্য সামান্য ব্যক্তির নিন্দা করা হয়নি। সাধারণ ব্যক্তির মাংসভক্ষণ সিদ্ধ করার জন্য আমি মূল লেখায় অনেক বেদমন্ত্র দিয়েছি, যার মধ্যে একটি নিয়েও তিনি কথা বলেননি, সেগুলো খণ্ডন করা তো দূরের কথা। নিজের পক্ষ অবলম্বন করার জন্য তিনি যে বেদমন্ত্রটির উপর নির্ভর করেছিলেন, তাতে পাঁচটি ভুল, তথ্যসূত্র অশুদ্ধ এবং অর্থের অনর্থ করা হয়েছে।

---

১ স্বামীজী বেদের গদ্য এবং পদ্যকে মন্ত্র বলেন, সুক্ত বলেন না

২ দেখুন, আপ্তে কর্তৃক সম্পাদিত, প্র্যাকটিক্যাল সংস্কৃত-ইংলিশ ডিকশনারী

পূর্বাগ্রহ দ্বারা প্রভাবিত

পাঁচ ব্রাহ্মণের একটা গরু কেটে খাওয়ার যে কথাটি, এটি আমার কথা নয়, স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি কথার অনুবাদ। এর দায়ও বিবেকানন্দেরই।

প্রাচীন ভারতে গোহত্যা হত না, এটা একেবারেই ভ্রান্ত, ভুল কথা। আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রে 'শূলগব' প্রকরণে ভিন্ন ভিন্ন রঙের গরু হত্যা করার বিধান রয়েছে, যাকে গবাময়ন (একাষ্টকা) বলা হত, যেটা মাঘ মাসে চার দিন পালন করা হত। কাত্যায়ন অতিরাত্রে (১৪/২/১১) এ বিষয়টিকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

প্রাচীন ভারতে গোহত্যার উল্লেখ ধর্মীয় এবং অন্যান্য সাহিত্য ছাড়াও আয়ুর্বেদের পুস্তকেও পাওয়া যায়। চরকসংহিতায় (চিকিৎসাস্থান, ১৯/৪) লেখা আছেঃ ততো দক্ষযজ্ঞপ্রত্যবরকালং মনোঃ পুত্রাণাং তরিষ্যন্নাভাগেক্ষ্বাকুনৃগশার্যাত্যাদীনাং চ ক্রতুষু 'পশুনামেবাভ্যনুজ্ঞানাত্' পশাবঃ প্রোক্ষণমাপুঃ... অতশ্চ প্রত্যবরকালং পৃষধ্রেণ দীর্ঘসত্রেণ যজতা পশুনামভাবাদ্ গবালম্ভঃ প্রবর্তিতঃ।

অর্থাৎ, দক্ষযজ্ঞের পর, মনুর নরিষ্যন্, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, শর্যাতি প্রভৃতি পুত্রেরা 'বেদে পশু হত্যা করার আদেশ আছে' এমন মনে করে যজ্ঞে পশুদের প্রোক্ষণ এবং হত্যা করা শুরু করলেন। এর পর দীর্ঘকাল যজ্ঞ করার ফলে পৃষধ্র অন্য পশুর অভাবে গরু হত্যা করা শুরু করে দিয়েছিলেন।

পারস্কর গৃহ্যসূত্রে (৩/১/২৬, ৩১) অতিথিকে গোঘ্ন (গোহত্যাকারী) বলা হয়েছে। এই শব্দটি সংস্কৃতের প্রাচীন ব্যাকরণ গ্রন্থ অষ্টাধ্যায়ীতেও পাওয়া যায়। পাণিনি একটি বিশেষ সূত্রে লিখেছেনঃ দাশগোঘ্নৌ সম্প্রদানে (অষ্টাধ্যায়ী ৩/৪/৭৩)। এর তাৎপর্য হল দাতার্থক দাশ ধাতু থেকে সম্প্রদান অর্থে অচ্ প্রত্যয় হয় এবং কর্মসংজ্ঞক গো উপপদের সাথে হিংসার্থক হন্ ধাতু থেকে সম্প্রদান অর্থে ক প্রত্যয় হয়।

৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শতাব্দীর কাশিকাবৃত্তির লেখক এই সূত্রের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ আগতায় তস্মৈ দাতুং গাং ঘ্নন্তীতি গোঘ্নোঅতিথিঃ, নিপাতনসামর্থ্যাদেব গোঘ্ন ঋত্বিগাদিরুচ্যতে , ন তু চাণ্ডালাদি। অসত্যপি চ গোহননে তস্য যোগ্যতয়া গোঘ্নঃ ইত্যভিধীয়তে।[১]

অর্থাৎ, 'গোঘ্ন' শব্দ এভাবে তৈরি হয়ঃ আগত অতিথিকে দেওয়ার জন্য যেহেতু গো হত্যা করা হয়, তাই অতিথিকে গোঘ্ন (গো হত্যাকারী) বলা হয়। পুরোহিতদের আগমনেও গো হত্যা করা হয়, সুতরাং তাদেরও গোঘ্ন বলা হয়, চণ্ডাল প্রভৃতিকে নয়। গরু যখন হত্যা

---

১ কাশিকাবৃত্তি, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ২৭৩-২৭৪, চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ প্রকাশন, বারাণসী

করা হয় না, তখনও গোঘ্ন বলা হয়, কেননা সে গো হত্যা করানোর যোগ্য অধিকারী।

পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের ভাষ্যকার পতঞ্জলির[১] সমকালীন ভারতের অধ্যয়ণ করতে গিয়ে ড. প্রভুদয়াল অগ্নিহোত্রী তার গবেষণাগ্রন্থ 'পতঞ্জলিকালীন ভারত' এর ৫৯২ পৃষ্ঠায় গোঘ্ন শব্দের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেনঃ 'সমাংস মধুপর্কের অধিকারী প্রায়শই শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ) বা ঋত্বিক (পুরোহিত) ই হতেন। এদের আগমনে বিশেষত গাভী বা বৃষ হত্যা করা হত এবং এই মাংস দ্বারা তৈরি খাদ্য তাদের দেওয়া হত, এজন্য এই অতিথিদের 'গোঘ্ন' বলা হত।... গোহত্যার অধিকারী হওয়ার কারণে শ্রোত্রিয়কে 'গোঘ্ন' বলা হত।"

চতুর্দশ শতাব্দীর ভট্টোজি দীক্ষিত 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যা ভারতের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের ছাত্রদের ব্যাকরণের গ্রন্থ হিসাবে পড়ানো হয়। এর 'উত্তর কৃদন্ত' প্রকরণে 'দাশগোঘ্নৌ সম্প্রদানে' সূত্রটির ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছেঃ 'গাং হন্তি তস্মৈ গৌঘ্নোঅতিথিঃ' অর্থাৎ, তার জন্য গরুকে হত্যা করা হয়, তাই অতিথিকে গোঘ্ন বলা হয়। প্রায় এই কথাই চার বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য তার 'মাধবীয়া ধাতুবৃত্তিঃ' তে লিখেছেনঃ 'গৌর্যস্মৈ দান্ত হন্যতে স গোঘ্নঃ অতিথিঃ'[২] অর্থাৎ, যাকে দেওয়ার জন্য গো হত্যা করা হয়, তাকে গোঘ্ন অথবা অতিথি বলা হয়।

স্পষ্টতই, প্রাচীন ভারতে অতিথির জন্য গো হত্যা করা হত। কিছু লোকেরা এই তিক্ত সত্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে বলে থাকেন, 'গোঘ্ন' শব্দের 'হন্' ধাতুর অর্থ হত্যা করা নয় বরং ' প্রাপ্ত করা'। একথা সমস্ত প্রাচীন পরম্পরা এবং প্রাচীন ব্যাখ্যার বিপরীত তো বটেই, একথা অযৌক্তিক এবং অনর্থকও। 'প্রাপ্ত করা' মনে করে যদি 'গোঘ্ন' শব্দের অর্থ করা হয় তবে তা এমন হবে, 'যার জন্য গরু প্রাপ্ত করা হয়'।

এখন এখানে প্রশ্ন ওঠেঃ কি প্রাপ্ত করা হয়? কার কাছ থেকে প্রাপ্ত করা হয়? কিভাবে প্রাপ্ত করা হয়? অতিথির আগমনে কি মানুষেরা গরু কিনতে চলে যেত? ঘরে প্রথম থেকে থাকা গরুর দুধ দিয়ে কি অতিথি সৎকার করা যেত না? যদি অতিথির জন্য গরুর দুধের ব্যবস্থা করার জন্য গরু প্রাপ্ত করা হত, তাহলে কি প্রাচীন ভারতে সবার কাছে গরু থাকতো না, যেহেতু অতিথির আগমনে সবার অন্য কারো কাছ থেকে গরু প্রাপ্ত করার প্রয়োজন হত? অতিথি না এলেও তো মানুষেরা গরু আনতো, গরু প্রাপ্ত করতো। তখন তাদের কেন 'গোঘ্ন' বলা হত না, যদি 'ঘ্ন' (হন্) এর অর্থ বাস্তবে 'প্রাপ্ত করা' ই হত? শুধুমাত্র অতিথিকে কেন গোঘ্ন বলা হত?

'গোঘ্ন' এর অর্থ গোহত্যাকারী

১ সময় ১৫০ খ্রি. পূ.
২ পৃষ্ঠা ৩১৯

দ্বিতীয়ত, অতিথিকে যদি গরুর দুধ দেওয়ার অভিপ্রায়ই থাকতো, তাহলে তার জন্য বিশেষ করে 'গোঘ্ন' শব্দ ব্যবহার করার কি প্রয়োজন ছিল? যেমনি অতিথিকে জল, খাদ্য, বিছানা এবং অন্যান্য বস্তু দেওয়া হত, তেমনি গরুর দুধ দেওয়াই যদি অভিষ্ট হত তাহলে তার জন্য বিশেষ শব্দ তৈরি হত না, কারণ অন্যান্য জিনিস অতিথিকে দেওয়া হলেও তার বিশেষ কোনো নাম দেওয়া হয়নি। যদি জলঘ্ন, বিষ্টরঘ্ন, ভোজঘ্ন এমন শব্দ থাকতো, তাহলে হয়তোবা 'গোঘ্ন' শব্দের হন্ ধাতুর অর্থ 'প্রাপ্ত করা' এটা আমরা মেনে নিতাম।

এই অবস্থায় এবং প্রাচীন ব্যাখ্যার উপস্থিতিতে 'গোঘ্ন' শব্দের অর্থ গোহত্যাকারীই মানা যায়, 'যার জন্য গরু প্রাপ্ত করা হয়' এই অর্থ মানা যায় না।

আলোচক মহোদয় প্রাচীন ভারতে গরুর প্রতি সদ্ভাব প্রমাণ করার জন্য বৌদ্ধ গ্রন্থের 'সুত্তনিপাতের' দুটি গাঁথা (স্বামীজী এদের শ্লোক বলেন না) দিয়েছেন এবং বলেছেন, হিন্দু এবং ব্রাহ্মণেরা কখনো গোহত্যা করেনি।

উপদেশের প্রয়োজন কেন?

তার দাবী একদমই ভুল। বুদ্ধবচন থেকে এর বিপরীত কথাই জানা যায়। বুদ্ধ গরুকে ভালোবাসতে এবং তাকে না মারতে উপদেশ দিয়েছেন। যদি সেই সময়ে গরুকে আজকের মত সম্মান দেওয়া হত এবং একে হত্যা না করা হত, তাহলে বুদ্ধের এমন উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন কি ছিল?

দ্বিতীয়ত, বুদ্ধের অহিংসার আদর্শকে নিয়ে হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ ধর্মশাস্ত্রকারেরা প্রাণভরে তামাশা করেছিলেন। শঙ্করাচার্য বুদ্ধকে 'উল্টোপাল্টা কথা বলা পৃথিবীর শত্রু' বলেছিলেনঃ সুগতেন স্পষ্টীকৃতমাত্মনোঅসম্বদ্ধপ্রলাপিত্বং প্রদ্বেষো বা প্রজাসু। (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২/২/৩২) আরেক হিন্দু ধর্মের উদ্ধারকারী কুমারিল ভট্ট বুদ্ধের অহিংসার উপদেশকে 'কুকুরের চামড়ায় পড়া দুধের মত ব্যর্থ' বলেছিলেনঃ সন্মুলমপি অহিংসাদি শ্বদতিনিক্ষিপ্তক্ষীরবদনুপযোগি। (তন্ত্রবার্তিক)

এখানে এটা বলার আর প্রয়োজন নেই বুদ্ধের গোহত্যা না করার উপদেশের কেমন গুরুত্ব ধার্মিক হিন্দুরা দিয়েছিলেন!

বুদ্ধের সময় গরুর সাথে কেমন আচরণ করা হত এ সম্বন্ধে নিজে কিছু না বলে 'বিহার হিন্দি গ্রন্থ একাডেমি' কর্তৃক প্রকাশিত ' বুদ্ধকালীন সমাজ অউর ধর্ম' থেকে উদাহরণ দেওয়া উচিত বলে মনে করছি। এতে লেখা আছে, "যজ্ঞাগ্নিতে অশ্ব, বৃষভ, ষাঁড়, গাভী,

ভেড়া প্রভৃতি বিভিন্ন পশুদের আহুতি দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় ... 'পালিনিকায়' এ গোঘাতক, মেষঘাতক, অজঘাতক, শুকরঘাতক , মৃগলুব্ধক, শাকুনিক এবং হত্যাগৃহের উল্লেখ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে, সমাজে ব্যাপক হারে মাংসাহারের ফলে সমাজে এমন অনেক পেশার উদ্ভব হয়, যাতে পশুপাখি ধরা, মারা এবং মাংস বিক্রয় করা হত। বৌদ্ধ লেখকেরা তাদের ব্রাহ্মণ বিরোধের কারণ হিসাবে ব্রাহ্মণদের গোহত্যা এবং গোমাংসভক্ষণের অতিরঞ্জিত বিবরণ দিয়েছেন। 'পালিনিকায়' এ গোঘাতক এবং তার শিষ্য, গোহত্যাস্থল এবং গোহত্যায় ব্যবহৃত ছুরির উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে গোমাংস খাওয়া হত।"[১]

বৌদ্ধ সাহিত্যে এমন অনেক কথা পাওয়া যায় যা থেকে প্রমাণ হয়, প্রাচীন ভারতে শুধু যে গোহত্যা হত তাই নয়, বরং গোমাংসও ভক্ষণ করা হত। 'মহাবগ্গ' (৪) এ উল্লেখ আছে, ষড়বর্গীয় ভিক্ষু গোমাংস খেতেন, 'তিত্তিরজাতক' (৪৩৮) এ উল্লেখ আছে, এক নির্গ্রন্থ (জৈন) সাধু হয়েছিলেন। সেই সাধু গরু, বাছুর এবং গাভী হত্যা করে খেয়েছিলেন।[২] নডগুট্ঠ জাতক (১৪৪) এ ষাঁড় হত্যা করে যজ্ঞ করার কথা পাওয়া যায়।

পণ্ডীত মোহনলাল মহতো 'বিয়োগী' রচিত 'জাতককালীন ভারতীয় সংস্কৃতি' এ উল্লেখ আছে, "এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, যিনি বেদের পরম বিদ্বান ছিলেন। তিনি বনে কুটির বানিয়েছিলেন। সেখানে তিনি অগ্নি স্থাপন করে তাতে হত্যা করা ষাঁড়ের মাংস আহুতি দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিছু শিকারী ব্রাহ্মণের অনুপস্থিতে সেই ষাঁড়কে হত্যা করে খেয়ে ফেলেছিল। ব্রাহ্মণ লবণ আনার জন্য গ্রামের দিকে গিয়েছিলেন। ষাঁড়কে হত্যা করে খাওয়ার জন্য তিনি লবণের ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলেন। অভাগা ব্রাহ্মণের সেই ইচ্ছাও পূর্ণ হল না। ষাঁড়ের হত্যা করে অগ্নি দেবের পূজা করার ইচ্ছা কোনো বিচিত্র ব্যাপার ছিল না। যেখানে ফল, ফুল, অন্নের চাইতেও মাংস সস্তা হয় এবং সকলেই মাংস খায়, সেখানে ষাঁড়, গাভী, শুকর প্রভৃতির কোনো মাহাত্ম্য থাকে না।" (পৃষ্ঠা ২১৫)

পণ্ডিত মহোদয় উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, জাতক কথায় ষাঁড়, গাভী এসব ব্রাহ্মণেরাই হত্যা করতেন। একজন ক্ষত্রিয়ও ষাঁড় অথবা গাভীর হত্যা পূজা অথবা ভোজনের জন্য করেননি, বৈশ্যও করেননি, শূদ্র, চণ্ডালও করেননি। ব্রাহ্মণই ছিলেন জাতক যুগের গোহত্যাকারী বর্ণ। (ঐ, পৃষ্ঠা ২১৬)

মজাদার তথ্য

এই বক্তব্য অনেকটাই সত্য বলে মনে হয়, কেননা গোমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণরাই পুরোহিতের

১ দেখুন, ডা. মদনমোহন রচিত বুদ্ধিকালীন সমাজ অউর ধর্ম, পৃষ্ঠা ৬৮,৭০
২ দেখুন জাতক কালীন ভারতীয় সংস্কৃতি পৃষ্ঠা ২১৫

কাজ করতেন এবং বলির জন্য গরুকে তারাই সংজ্ঞপন[১] করতেন।

একটি ব্যাপার খুব মজাদার যে, বেদ মান্যকারীরা এবং বেদ অনুসরণ করে গরু প্রভৃতি পশুর বলি প্রদানকারীরা এই হিংসার কাজকে সবসময় অহিংসাই বলে এসেছেন এবং বলিতে পশুহত্যা করে যে পশুর উপর কৃপা করা হয় এমনটাই বলে এসেছেন। বেদের এক প্রাচীন ভাষ্যকার স্কন্দস্বামী[২] ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের (১/১/৪) ভাষ্যে লিখেছেনঃ "যজ্ঞে হি সর্বস্যানুগ্রহো, ন হিংসা, যেঅপি হি তত্র পশ্বাদয়ো হিংস্যতে তেষামপ্যনুগ্রহমেব শিষ্টা স্মরন্তি- ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষাস্তির্যংচঃ পক্ষিণস্তথা। যজ্ঞার্থ নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবংত্যুচ্ছ্রিতীঃ পুনঃ ... তস্মাদুপপন্নং হিংসাবর্জিতত্বম্।"

অর্থাৎ, যজ্ঞের দ্বারা সকলেরই মঙ্গল হয়, কারোর হিংসা হয় না। যেসব পশুদের হত্যা করা হয়, তাদেরও মঙ্গলই হয়ে থাকে। পূর্বপুরুষেরা বলেছেন, "যেসব ঔষধি, পশু, বৃক্ষ, পক্ষী প্রভৃতি যজ্ঞে মারা যায়, তারা উচ্চগতি লাভ করে।" এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যজ্ঞে করা হিংসা হল অহিংসা।

মনুও এই কথাই বলেছিলেনঃ বৈদিকী হিংসা, হিংসা ন ভবতি। অর্থাৎ বেদ অনুসারে যে হিংসা করা হয়, তাকে হিংসা বলা হয় না।

স্বামী করপাত্রী তার বিশালকায় গ্রন্থ 'বেদার্থ পরিজ্ঞাত' এ লিখেছেনঃ যাজ্ঞিকপশুবধোঅপি পশুনাং স্বর্গপ্রাপকত্বান্ পশুযোনিনিবারণপূর্বকহিরণ্যশরীরপ্রাপ্তিহেতুত্বান্ পশুপরকারক এব। (...) যজ্ঞে পশুনামুপযোগস্ত পশুকল্যাণায় ভবতি (...) যস্মাত্ পশুরপকৃষ্টযোনের্বিমুক্তো দেবযোনৌ জায়তে।[৩]

অর্থাৎ, যজ্ঞে করা পশুবধ পশুদের জন্য স্বর্গপ্রদায়ী এবং পশুরা পশুযোনি নিবারণ করে দিব্যশরীর লাভ করার ফলে এতে পশুদের উপকারই হয়। যজ্ঞীয় পশু অপকৃষ্ট যোনি থেকে মুক্ত হয়ে দেবযোনি লাভ করে।

শঙ্করাচার্য জয়েন্দ্র সরস্বতী এবং স্বামী করপাত্রী যজ্ঞীয়পশু সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন, তা শাস্ত্র অনুসরণ করেই বলেছেন, এসব কথা কপোলকল্পিত নয়। মনু বলেছেনঃ

ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষাস্তির্যংচঃ পক্ষিণস্তথা।
যজ্ঞার্থ নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুৎসৃতীঃ পুনঃ।।
-মনুস্মৃতি ৫/৪০

---

১ অস্ত্রের আঘাত ছাড়াই পশুর নাক মুখ বন্ধ করে শ্বাস রোধ করে তাকে হত্যা করা

২ সময় ৭ শতাব্দীর আগে

৩ বেদার্থপারিজাত, ভাগ ২, পৃষ্ঠা ১৯৭৭-১৯৭৮

অর্থাৎ যজ্ঞের জন্য মৃত্যুবরণ করা ঔষধী (ব্রিহী প্রভৃতি) , পশু (ছাগ প্রভৃতি), বৃক্ষ, তির্যক (কচ্ছপ প্রভৃতি) এবং পক্ষী পরবর্তী জন্মে উচ্চ যোনি লাভ করে।

শুধু তাই নয়, মনুর আদেশ অনুসারে মধুপর্ক, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ এবং দেবকার্যে পশু বধ করা উচিতঃ

মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্মণি,
অত্রৈব... পশবো হিংস্যা...
-মনুস্মৃতি ৫/৪১

অর্থাৎ, মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকার্য (শ্রাদ্ধ) এবং দেবকার্য এর জন্য পশু বধ করা উচিত।

অনেক লোক বলেন যে, যজ্ঞের জন্য ব্যবহৃত শব্দ 'অধ্বর' এর অর্থ যেহেতু হিংসারহিত সুতরাং যজ্ঞে কিভাবে গরু প্রভৃতি পশুকে হিংসা করা হয়ে থাকতে পারে?

এই কথাটি সত্য নয়। 'অধ্বর' শব্দের যে ব্যুৎপত্তি তারা প্রায়শই সামনে এনে থাকেন তা নিরুক্তকার যাস্ক শতপথব্রাহ্মণ হতে অসম্পূর্ণ ভাবে তার নিরুক্তে উদ্ধৃত করেছেন। তাই এই ব্যুৎপত্তি ভ্রমাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যজ্ঞে হিংসা হত না। কিন্তু যখন আমরা শতপথ ব্রাহ্মণে দেওয়া সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি দেখি তখন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে 'অধ্বর' শব্দের ব্যুৎপত্তিতে প্রযুক্ত হিংসার সাথে যজ্ঞে হওয়া হিংসার কোনো সম্পর্ক নেই বরং যজ্ঞকর্তাদের উপর করা হিংসার সাথে এর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে 'অধ্বর' শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়ে বলা হয়েছেঃ দেবান্হ বৈ যজ্ঞেন যজমানান্ৎসপত্না অসুরা দুধূর্ষাংচক্রুঃ। তে দুধূর্ষন্ত এব ন শেকুর্ধুর্বিতুং তে পরাবভূবুস্তস্মাদ্ যজ্ঞোঅধ্বরো নাম। (শতপথ ব্রাহ্মণ ১/৪/১/৪০) অর্থাৎ, যখন দেবতারা যজ্ঞ করছিলেন তখন তাদের শত্রু অসুরেরা সেই যজ্ঞকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল কিন্তু ধ্বংস করার ইচ্ছা করেও তারা ধ্বংস করতে পারেনি। তারা হেরে গিয়েছিল, তাই যজ্ঞের নাম অধ্বর হল।[১]

এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, অধ্বরকে যে কারণে অধ্বর বলা হত তা হল, যজ্ঞকর্তাদের হিংসা করা সম্ভব হয়নি। এর সাথে যজ্ঞে করা হিংসার (পশুহত্যা প্রভৃতির) কোনো সম্পর্ক নেই।

সপ্তম শতাব্দীর ভাষ্যকার স্কন্দস্বামী বলেন, অধ্বরকে অধ্বর বলার কারণ হল, যজ্ঞে করা

১ দেখুন শতপথ ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায় কৃত হিন্দি টীকা সহিত, পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯

হিংসা আসলে হল যজ্ঞে মৃত পশুদের প্রতি অনুগ্রহ। তাই এটা হিংসা নয় বরং অহিংসাঃ ধ্বরণং ধ্বরো হিংসা যস্মিন্নাস্তি সোঽধ্বরঃ। যেঅপি হি তত্র পশবাদয়ো হিংস্যংতে তেষামণ্যনুগ্রহমেব শিষ্টাঃ স্মরন্তি। তস্মাদুপপন্নং হিংসাবর্জিতত্বম্। অর্থাৎ ধ্বরণ বা ধ্বর এর অর্থ হল- হিংসা, যজ্ঞে তা হয় না বলে, তাকে অধ্বর বলা হয়। যজ্ঞে যে সকল পশুকে হত্যা করা হয় শিষ্ট লোকেরা তাদের মৃত্যুকে তাদের প্রতি অনুগ্রহ বলে থাকেন। এভাবে হিংসার অভাবের কারণে যজ্ঞকে অধ্বর (হিংসারহিত) বলা হয়। (ঋগ্বেদ ১/১/৪ এর স্কন্দভাষ্য)

এখানে হিংসাকে অনুগ্রহ বলে ভাষ্যকার অত্যন্ত নিষ্ঠুর তামাশা করেছেন। তিনি পশুর হত্যাকে (হিংসাকে) অহিংসা বানিয়ে যজ্ঞকে অধ্বর (হিংসারহিত) সিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাই তো বলেছেনঃ তস্মাদুপপন্নং (এভাবে সিদ্ধ হয়ে গেল) হিংসাবর্জিতত্বম (তার হিংসারহিত হওয়া) !

চার বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্যও অধ্বর এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, যজ্ঞকে অধ্বর বলার কারণ হল রাক্ষস প্রভৃতিরা একে হিংসা করতে পারে না, অর্থাৎ তাকে নষ্ট করতে পারে নাঃ অধ্বরং হিংসারহিতম্। ন হ্যগ্নিনা সর্বতঃ পালিতং যজ্ঞং রাক্ষসাদয়ো হিংসিতুং প্রভবংতি। (ঋগ্বেদ ১/১/৪ এর সায়ণভাষ্য)

অর্থাৎ অধ্বর বা যজ্ঞকে হিংসারহিত বলার কারণ হল সর্বদিক থেকে অগ্নি দ্বারা সুরক্ষিত যজ্ঞকে রাক্ষস প্রভৃতিরা হিংসা করতে সমর্থ হয় না।

এভাবে আমরা দেখতে পাই 'অধ্বর' শব্দের তিনটি ব্যুৎপত্তির দুটিতে এতে হওয়া হিংসার সাথে কোনো সম্পর্ক পাওয়া যায় না। একটি ব্যুৎপত্তিতে যেখানে যজ্ঞে হওয়া হিংসার কথা বলা হয়েছে সেখানে সেই হিংসাকে অহিংসা বলে যজ্ঞের অধ্বর নাম সিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং নিরুক্তে উল্লেখিত 'অধ্বর' শব্দের অসম্পূর্ণ অর্থ দিয়ে যজ্ঞে যে হিংসা হত না তা প্রমাণ করা যায় না, যজ্ঞে হওয়া মূক পশুদের হত্যাকে অস্বীকার করা যায় না। হাজার বছর ধরে যজ্ঞের বলিবেদীতে এসবই করা হয়েছে।

কিছু লোক বলেন যে, বেদ স্পষ্ট শব্দে আদেশ দিচ্ছেনঃ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ। অর্থাৎ হিংসা করো না। এমতাবস্থায় যজ্ঞে কিভাবে হিংসা হতে পারে?

এই কথাটি সঠিক নয়। বেদের ব্যাখ্যাকার যাস্ক পর্যন্ত এই কথার খণ্ডন করেছেন, যা এরা এখন বলছেন। তিনি বলেছেন, উক্ত মন্ত্রের প্রয়োগ কুঠার চালানোর সময়, হিংসা করার সময় করা হয়। যখন হিংসা করার জন্য হাতে কুঠার নিয়ে কারো উপর চালানো হয়, তখন এই মন্ত্র পাঠ করা হয়। কিন্তু আমরা একে হিংসা বলতে পারি না, কারণ

বেদের দৃষ্টিতে এটা অহিংসাঃ আম্নায়বচনাদহিংসা প্রতীয়েত। (নিরুক্ত ১/১৬)

এমনই আরেকটি মন্ত্র আছে, যেটা হিংসা করার সময় পাঠ করা হত, কিন্তু তার অর্থ কৃতকর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেটি হলঃ ওষধে ত্রায়স্বৈনম্। (দেখুন তৈত্তিরীয়সংহিতা ১/২/১, ১/৩/৫, ৬/৩/৩, ৬/৩/৯ ; মৈত্রায়ণীসংহিতা ১/২/১, ৩/৬/২, ১/২/১৪, ৩/৯/২, ১/২/১৬, ৩/১০/১ ; শুক্লযজুর্বেদ ৪/১, ৫/৪২, ৬/১৫) এর অর্থ, "হে কুশা ঘাসের খড়, একে রক্ষা করো।" কিন্তু এই মন্ত্রটি কেশ কর্তন করার সময় পাঠ করা হয়। যজ্ঞে বলির পশুকে বাধার জন্য যূপ তৈরির বৃক্ষকে কাটার সময়, পশুর পেট চিরে ফেলার সময় এই মন্ত্রটি পাঠ করা হয়। এই বিষয়ে আপস্তম্ভ প্রভৃতি শ্রৌতসূত্র দেখা যেতে পারে। মীমাংসা-শাবরভাষ্যম এর যুধিষ্ঠির মীমাংসক কৃত হিন্দি ব্যাখ্যার ১৮৯ পৃষ্ঠায়ও দেখা যেতে পারে।

কিছু লোক বলেন, 'আলম্ভ' শব্দের অর্থ হত্যা করা নয়, বরং স্পর্শ করা। সুতরাং গবালম্ভ যজ্ঞে গরুর হত্যা করা হত না বরং তাকে কেবল ছোঁয়া হত। এ কথাটি ভুল। চরক সংহিতায় (১৯/৪) 'আলম্ভ' শব্দটি পাওয়া যায় এবং সেই শব্দটিও পাওয়া যায়, যার অর্থ স্পর্শ করা। এই দুটো শব্দকে একই স্থানে পাওয়া যায় বলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যায়ঃ আদিকালে খলু যজ্ঞেষু পশাবঃ সমালভনীয়া বভূবুঃ, নালম্ভায় প্রক্রিয়ন্তে স্ম। অর্থাৎ, আদিকালে যজ্ঞে নিশ্চয় পশুদের সমালভন (স্পর্শ) করা হত। তা আলম্ভনের (হিংসা বা হত্যার) জন্য আসলে করা হত না।

এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'আলভ' এবং 'আলম্ভন' দুটো ভিন্ন শব্দ। প্রথমটির অর্থ স্পর্শ করা, দ্বিতীয়টির অর্থ হত্যা করা। কিন্তু শীঘ্রই আলভ শব্দ এবং আলম্ভ শব্দের অর্থ মিলেমিশে গিয়েছিল। তাই ব্যাখ্যাকারেরা আলভ এবং আলম্ভ শব্দের একই অর্থ (হত্যা অথবা) হিংসা করেছিলেন।

প্রসিদ্ধ আর্যসমাজী পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক লিখেছেন, "উত্তরকালে যখন লম্ভ এর অধিকাংশ প্রয়োগ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তখন পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণবিদেরা লম্ভ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ভাষায় অল্পাবশিষ্ট প্রয়োগের লভ ধাতুতে তুম প্রত্যয়ের আগম করে ব্যাখা করে দিয়েছিলেন। এই ধাতু-এক্যকল্পনার কারণে আলম্ভ ধাতুর যে অর্থ ছিল, সেটা আলভের মনে হওয়া শুরু হয়েছিল। আর এই কারণে উত্তরকালে 'আলভতে' (স্পর্শ করে থাকে) , 'আলভেত' (স্পর্শ করে) পদের অর্থ 'আলম্ভতং কুর্যাত্' (হিংসা করে) করা শুরু হয়েছিল।" (শ্রৌতযজ্ঞমীমাংসা, পৃষ্ঠা ১৮৩)

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় , 'আলম্ভ' এর অর্থ কেবলই যে হিংসা (হত্যা) ছিল তাই নয়, বরং এর অর্থ অতি প্রাচীন কাল থেকেই 'স্পর্শ করা' অর্থবাচক আলভ শব্দের

মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। সুতরাং আলম্ভ শব্দের অর্থ যে স্পর্শ করা তা একেবারেই তথ্যনিষ্ঠ নয়।

কিছু লোকের কথা হল, গাভীর জন্য 'অঘ্ন্যা' শব্দ ব্যবহার করা হয়। 'অঘ্ন্যা' শব্দের অর্থ হল হত্যার অযোগ্য। সুতরাং যজ্ঞ প্রভৃতিতে গরুর বলি দেওয়া হত না।

তথ্যের আলোকে এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। এটা সত্য যে গাভী বোঝাতে 'অঘ্ন্যা' শব্দ ব্যবহার করা হয়। 'অঘ্ন্যা' শব্দের একটি অর্থ হত্যা করার অযোগ্য। কিন্তু এটাই সম্পূর্ণ সত্য নয়। নিরুক্তে (১১/৪৩) 'অঘ্ন্যা' শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে 'অঘ্ন্যা' শব্দের একটি নয় বরং দুটি অর্থ পাওয়া যায়ঃ অঘ্ন্যাঅহন্তব্যা ভবত্যঘঘ্নীতি বা। অর্থাৎ অঘ্ন্যা এর অর্থ- হত্যা করার অযোগ্য অথবা পাপনাশিনী।

স্পষ্টতই, অঘ্ন্যা শব্দের অর্থ প্রদানকারী যাস্ক এর কেবল একটি অর্থকেই মানতেন না। তিনি অনুমান করে এর দুটি অর্থ দিয়েছেন। সুতরাং তার অহন্তব্যা (হত্যার অযোগ্য) অর্থকেই সামনে আনা এবং দ্বিতীয় অর্থ – পাপনাশিনীকে লুকানো কি বৌদ্ধিক ছলনা নয়?

ঋগ্বেদ (১/১৬৪/৪০) এ কয়েকজায়গায় গাভীর স্থলে 'অঘ্ন্যা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও যজ্ঞে বা যজ্ঞের বাইরে এর হিংসায় নিষেধ করা হয়নি। এক স্থানে বলা হয়েছেঃ অদ্ধি তৃণমঘ্ন্যে বিশ্বদানীং পব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী। অর্থাৎ, হে অঘ্ন্যে (গাভী) , ঘোরার সময় তুমি সদা ঘাস এবং শুদ্ধ জল খেয়ো।

এখানে গরুকে ঘাস খাওয়ার এবং শুদ্ধ জল পান করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাকে হত্যা এবং তাকে হিংসা না করার কথা এখানে বলা হয়নি।

দুহামশ্বিভ্যাং পয়ো অঘ্ন্যেয়ং (ঋগ্বেদ ১/১৬৪/২৭) অর্থাৎ, এই অঘ্ন্যা (গাভী) অশ্বিনীদের জন্য দুধ দিক। এখানে গাভীকে দুধ দিতে প্রার্থনা করা হয়েছে। এখানেও তার হিংসায় নিষেধ করা হয়নি।

কিছু লোকেরা যজুর্বেদ এর ১৩ অধ্যায় এর ৪৩ তম মন্ত্র দেখিয়ে বলে যে, এখানে গরুকে হিংসা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

তাদের এই দাবী সম্পূর্ণ ভুল, কারণ এখানে মানুষদের করা গোহত্যায় নিষেধ করা হয়নি। এখানে তো কেবল অগ্নি দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে যে তিনি যাতে গাভীকে গ্রাস না করেন, তাকে না পোড়ান, তার হত্যা না করেনঃ

অগ্নিমীড়ে পূর্বচিত্তিং নমোভিঃ...
... গাং মা হিংসীরদিতিং বিরাজম্।
-যজুর্বেদ ১৩/৪৩

অর্থাৎ, হে অগ্নি, আমি বার বার নমনের দ্বারা পূজা করছি। তুমি বিরাজ (দুধ রূপ প্রকাশ দানকারী) গাভীকে হিংসা করো না।

একই ধরণের কথা এই অধ্যায়ের ৪৯ তম মন্ত্রেও বলা হয়েছেঃ

ঘৃতং দুহানামদিতিং জনায়াগ্নে মা হিংসী...
-যজুর্বেদ ১৩/৪৯

অর্থাৎ, হে অগ্নি মানুষের জন্য ঘৃতের দোহনকারী অদিতিকে (গাভীকে) আপনি হিংসা করবেন না।

এই ধরণের প্রার্থনাকে গোবধের নিষেধাজ্ঞা বলা যায় না। তাই এসবের উপর ভিত্তি করে এটা বলা যায় না যে, বেদ গোবধে নিষেধ করে। এর বিপরীতে ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রে গোবধকে শত্রুবধের উপমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যার দ্বারা বোঝা যায় গোবধ কতটা প্রচলিত ছিল! কারণ সকারাত্মক উপমা প্রসিদ্ধ, সর্বজ্ঞাত এবং প্রচলিত প্রথাসমূহ থেকেই দেওয়া হয়ে থাকে, প্রতিবন্ধিত এবং নিন্দনীয় জিনিস থেকে নয়।

ঋগ্বেদ বলছেঃ

মিত্রক্রুবো যচ্ছসনে ন গাবঃ পৃথিব্যা আপৃগমুয়া শয়ন্তে।
-ঋগ্বেদ ১০/৮৯/১৪

অর্থাৎ যেমন গোহত্যা স্থানে গাভীদের কাটা হয়, তেমনি তোমার এই অস্ত্র দ্বারা নিহত হয়ে মিত্রদ্বেষী রাক্ষসেরা পৃথিবীতে পড়ে অনন্ত নিদ্রায় শয়ন করে।

স্পষ্টতই, এখানে কোনো নায়ক অথবা বীরের সম্বন্ধে প্রশংসামূলক কথা বলা হয়েছে। এখানে লোকপ্রচলিত এবং লোক অনুমোদিত কাজেরই উপমা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বোঝা যায়, গোবধ একটি সামান্য এবং সর্ববিদিত বিষয় ছিল।

কিছু লোক অথর্ববেদের তথ্যসূত্র দিয়ে বলেন এতে গোবধকারীকে সীসার গুলি দ্বারা বিদ্ধ করতে বলা হয়েছে।

কিন্তু তথ্যের সাথে তাদের দাবী সঙ্গতিপূর্ণ নয় কারণ ওই মন্ত্রে কেবল গাভীর কথা বলা হয়নি বরং ঘোড়া এবং পুরুষের কথাও বলা হয়েছে। সেখানে এটাও বলা হয়েছে, যে 'আমাদের' গাভী, 'আমাদের' ঘোড়া এবং 'আমাদের লোককে' হত্যা করে তাকে সীসার গুলি দিয়ে বিদ্ধ করবোঃ

যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্চং যদি বা পুরুষম্
তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোহসো অবীরহা।
-অথর্ববেদ ১/১৬/৪

অর্থাৎ, যদি তুমি 'আমাদের' গাভী, 'আমাদের' ঘোড়া, 'আমাদের' লোকেদের মারো, তাহলে তোমাকে সীসার গুলি দিয়ে বিদ্ধ করবো, যাতে তুমি আমাদের বীরদের নষ্ট করতে না পারো।

এটা আসলে গোবধের নিষেধ নয়, বরং নিজের সম্পত্তি বাঁচানোর জন্য হুমকিমাত্র। এর দ্বারা গোহত্যাকারীদের সীসার গুলি দ্বারা বিদ্ধ করে হত্যা করার কথা প্রমাণিত হয় না; বরং এটা প্রমাণিত হয় যে, যারা 'আমাদের' গাভীকে হত্যা করবে, 'আমাদের' ঘোড়াকে হত্যা করবে, 'আমাদের' মানুষদের হত্যা করবে, তাদের আমরা সীসার গুলি দ্বারা বিদ্ধ করবো। যদি কেউ 'আমাদের' গাভীকে, 'আমাদের' ঘোড়াকে , 'আমাদের' মানুষদের না মেরে অন্য কারো গাভী, ঘোড়া ও মানুষকে হত্যা করে তাহলে? তখন স্পষ্টতই কিছু করার আদেশ দেওয়া হয় নি। বেদে কেবল কারো নিজের সম্পত্তির ক্ষতি হওয়ার ফলে তার ক্রোধের অভিব্যক্তি রয়েছে। এর দ্বারা না প্রমাণ হয় তখন গোহত্যা হত না, না প্রমাণ হয় তখন গোহত্যায় নিষেধাজ্ঞা ছিল।

যদি এটা বলা হয়, গাভী অবধ্যা (অহন্তব্যা) হওয়ার কারণে তাকে হত্যাকারীকে গুলি দ্বারা বিদ্ধ করার হুমকি দেওয়া হয়েছে, তবুও লাভ হবে না। এখানে তো 'আমাদের' ঘোড়াকে হত্যাকারীকেও গুলি দ্বারা বিদ্ধ করতে বলা হয়েছে। তাহলে কি ঘোড়া আর গরু এক সমান? তাহলে কি ঘোড়া দেবতা?

আসলে উপরে যে ক্রোধ প্রকাশিত হয়েছে, তা তখনও দেখা যায় যখন এমন কিছুর ক্ষতি করা হয় যা অবধ্য (অহন্তব্যা) নয়। মুরগীপালকেরা মুরগী পালন করে থাকেন যাতে মানুষেরা মুরগীকে কিনে কেটে খেতে পারে। তারা প্রথম দিন থেকেই ব্যাপারটি জানেন যে, মুরগীকে হত্যা করানোর জন্যই আমরা তার উৎপাদন করছি। কিন্তু যদি

কোনো চোর সেই মুরগি চুরি করে, যদি কেউ অকারণে সেই মুরগিকে হত্যা করে, যদি কোনো কুকুর মুরগিকে মেরে খেয়ে ফেলে, তাহলে তার মালিক চোর, হত্যাকারী অথবা কুকুরকে গুলি মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে পারেন এবং তার মুখ থেকে অথর্ববেদের উক্তির মতই কথা বের হতে পারে। কিন্তু তার এই কথা শুনে কি এটা মনে করার কোনো প্রয়োজন আছে যে, তার ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ হল মুরগি অঘ্ন্যা (অহন্তব্যা /হত্যার অযোগ্য)?

না মুরগি বধের অযোগ্য, না তার হত্যায় কোনো নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বরং বিক্রি হওয়ার পর তার মৃত্যু একপ্রকার সুনিশ্চিত। কিন্তু তারপরেও মালিকের অনুপস্থিতিতে যদি মুরগিকে অন্য কেউ হত্যা করে, তাহলে তার মালিক ক্রুদ্ধ হন, যেহেতু তার সম্পত্তি এর ফলে নষ্ট হয়েছে। পূর্বে উদ্ধৃত অথর্ববেদের মন্ত্রে একই ধরণের বিষয়ে বলা হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা কোনোভাবেই গোবধের নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয় না।

কিছু লোক বলেন যে, বেদে সকল প্রকারের হিংসায় নিষেধ করা হয়েছে। এর প্রমাণ হিসেবে তারা নিচে উদ্ধৃত মন্ত্রাংশগুলো দিয়ে থাকেনঃ

১) ইমং মা হিংসীর্দ্বিপাদং পশুম্। (যজুর্বেদ ১৩/৪৭)
অর্থাৎ দ্বিপদযুক্ত পশুদের প্রতি হিংসা করো না।

২) ইমং মা হিংসীরেকশফং পশুম্। (যজুর্বেদ ১৩/৪৮)
অর্থাৎ, এক ক্ষুরযুক্তকে (ঘোড়াকে) হিংসা করো না।

৩) ঘৃতং দুহানামদিতিং জনায়াগ্নে মা হিংসীঃ ... (যজুর্বেদ ১৩/৪৯)
অর্থাৎ, ঘৃত দোহন করা গরুর প্রতি হিংসা করো না।

৪) মা হিংসীঃ উষ্ট্রমারণ্যম্(যজুর্বেদ ১৩/৫০)
অর্থাৎ, বন্য উটেদের হিংসা করো না।

এই চারটি মন্ত্রকে অসম্পূর্ণ ভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। যদি সম্পূর্ণ মন্ত্রকে পড়া হয় তাহলে বোঝা যায়, বাস্তবে এখানে পক্ষপাতদুষ্ট কথা বলা হচ্ছে। এখানে যদি একজনের প্রতি হিংসা না করতে বলা হয়ে থাকে তাহলে, অন্যের প্রতি হিংসা করার প্রার্থনাও এখানে করা হয়েছে এবং এ কাজের প্রেরণাও এখানে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এখানে মানুষের দ্বারা করা হিংসার কথা বলা হয় নি বরং অগ্নির দ্বারা করা হিংসা থেকে বাঁচার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। এখানে দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, কোনো বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা এখানে আরোপ করা হয়নি।

প্রথম মন্ত্রটি দেখুনঃ

ইমং মা হিংসীর্দ্বিপাদং পশুং সহস্রাক্ষো মেধায় চীয়মানঃ,
ময়ুং পশুং মেধ্যমগ্নে জুষস্ব তেন চিন্বানস্তন্বো নিষীদ,
ময়ুং তে শুগৃচ্ছতু যং দ্বিষ্মস্তং তে শুগৃচ্ছতু।
-যজুর্বেদ ১৩/৪৭

অর্থাৎ, হে অগ্নি আপনি দ্বিপদী এবং পশুদের প্রতি হিংসা করবেন না। আপনি সহস্র চক্ষু সম্পন্ন। আপনাকে যজ্ঞে আহ্বান করছি। আপনি অন্নের বৃদ্ধি করুন। পশুদের বৃদ্ধি করুন। আপনি আমাদের বৈভব প্রদান করুন, আমরা যাতে সুখী জীবনযাপন করতে পারি। আপনার ক্রোধ সেই মানুষকে ধ্বংস করুক, যে আমাদের দ্বেষ করে।

এখানে দুটি বিষয় স্পষ্ট। প্রথমটি হল, এখানে অগ্নি দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে যাতে তিনি 'ইমং' (আমাদের এই) দ্বিপদী এবং পশুদের রক্ষা করেন। এখানে নিজেদের মানুষদের এবং পশুদের বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে, সকল মানুষ এবং সকল পশুদের জন্য এখানে প্রার্থনা করা হয়নি। আর এখানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি, বরং প্রার্থনা করা হয়েছে। তাই একে বিধানমূলক বলে মনে করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, এই মন্ত্রটি অহিংসাবাদী নয়, বরং হিংসাবাদী; কারণ শেষ অংশে তাদের নষ্ট করতে প্রার্থনা করা হয়েছে যারা 'আমাদের' দ্বেষ করে, সে মানুষ হোক বা পশু।
সুতরাং এই মন্ত্রে হিংসার নিষেধ প্রমাণিত হয় না।

দ্বিতীয় মন্ত্র দেখুনঃ

ইমং মা হিংসীরেকশফং পশুং কনিক্রদং বাজিনং বাজিনেষু,
গৌরমারণ্যমনু তে দিশামি তে দিশামি তেন চিন্বানস্তন্বো নিষীদ,
গৌরং তে শুগৃচ্ছতু যং দ্বিষ্মস্তং শুগৃচ্ছতু।
-যজুর্বেদ ১৩/৪৮

অর্থাৎ, হে অগ্নি, আপনার ঘোড়া অত্যন্ত গতিশীল। সে হিনহিনিয়ে নিজের স্ফূর্তি প্রদর্শন করে। আপনি আমাদের এই ঘোড়ার প্রতি হিংসা করবেন না, আপনি বন্য পশুদের উত্যক্ত করুন। আপনি নিজের জ্বালায় শরীরকে বর্ধিত করুন। আমরা যাদের দ্বেষ করি, আপনার ক্রোধ তাকে পীড়িত করুক।

এখানেও নিজের ঘোড়াকে বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে, সব পশুদের বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা করা হয়নি। এখানে তো অন্য পশুদের প্রতি অগ্নি দেবতাকে হিংসক হতে বলা হয়েছে। এখানে তো পুরোপুরি হিংসার কথাই বলা হয়েছে।

এখানে নিজের পশুদের রক্ষা করার কথা বলা, প্রাণী বা পশুদের প্রতি দয়া বলে বিবেচিত হতে পারে না, বরং স্বার্থবশতঃ নিজের সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য এখানে প্রার্থনা করা হয়েছে।

শেষে আবার তাদের বিনষ্ট করতে বলা হয়েছে, যাদের সাথে বিরোধ আছে, যাদের প্রতি দ্বেষ আছে। এটা এক সঙ্কীর্ণ ব্যক্তির প্রার্থনা, যে স্বার্থের বাইরে না দেখতে পারে, না ভাবতে পারে। এসব কথা 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ' হতে শত ক্রোশ দূরে। সুতরাং এই মন্ত্রটি হিংসায় নিষেধ করে না এবং অহিংসার প্রচার করে না।

এখন তৃতীয় মন্ত্রটি দেখা যাকঃ

ইমং সহস্রং শতধারমুৎসং ব্যচ্যমানং সরিরস্য মধ্যে,
ঘৃতং দুহানামদিতিং মা হিংসীঃ পরমে ব্যোমন্,
গবয়মারণ্যমনু তে দিশামি তেন চিন্বানস্তন্বো নিষীদ,
গবয়ন্তে শুগৃচ্ছতু যং দ্বিষ্মস্তং তে শুগৃচ্ছতু।
-যজুর্বেদ ১৩/৪৯

অর্থাৎ, হে অগ্নি, আমাদের এই গাভী সহস্র ধারার মূল স্রোত। সে শরীরের মধ্যে ঘি নিঃসরণ করে। পরম ব্যোমে অবস্থান করে। আপনি এই গাভীর প্রতি হিংসা করবেন না, বন্য বৃষ, নীলগাই প্রভৃতি অন্য পশুদের প্রতি আপনি হিংসা করুন। আপনি নিজের শরীরকে বৃদ্ধি করে পশুদের (গবয়= নীল গাই) সাথে বিরাজ করুন, যাদের আমরা দ্বেষ করি। তাদের প্রতি আপনি আপনার ক্রোধ প্রকট করুন।

এখানে নিজেদের গাভীকে বাঁচানোর জন্য অগ্নির কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। শেষে উল্লেখিত পশু কিংবা গরুদের প্রতি এখানে কোনো সদ্ভাব দেখা যায় না। উল্টোদিকে বন্য পশুদের- গবয়দের (নীল গাই প্রভৃতির) প্রতি অগ্নিকে উস্কে দেওয়া হয়েছে, যাতে অগ্নি তাদের ধ্বংস করেন। একইভাবে তাদেরও ধ্বংস করতে বলা হয়েছে যাদের সাথে বিরোধ রয়েছে।

চতুর্থ এবং শেষ মন্ত্রটি হলঃ

ত্বষ্টুঃ প্রজানাং প্রথমং জনিত্রমগ্নে মা হিংসীঃ পরমে ব্যোমন্,
উষ্ট্রমারণ্যমনু তে দিশামি তেন চিন্বানস্তন্বো নিষীদ,
উষ্ট্রং ত্ব শুগৃচ্ছতু যং দ্বিষ্মস্তং তে শুগৃচ্ছতু।
-যজুর্বেদ ১৩/৫০

অর্থাৎ, হে অগ্নি, আপনি সর্বপ্রথম উৎপন্ন হয়েছেন। আপনি পরম ব্যোমে অবস্থান করেন। আপনি আমাদের হিংসা করবেন না। বন্য উটেদের নির্দেশ করছি, আপনি তাদের দ্বারা নিজের শরীরের বর্ধিত করুন। আপনি সেই উট এবং মানুষদের প্রতি ক্রোধ করুন, যাদের আমরা দ্বেষ করি।

যা দাবী করা হয়েছে, এই মন্ত্রে এর সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলা হয়েছে। দাবী করা হয়েছে যে, এখানে বন্য উটকে হিংসা না করতে বলা হয়েছে কিন্তু বন্য উটদের হিংসা করার কথা এখানে পাওয়া যাচ্ছে। এ দাবী হয় অজ্ঞানতাবশত করা হয়েছে, নতুবা নিজের কথাকে প্রমাণ করার জন্য জেনে শুনে মিথ্যা বলা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়টি নিন্দনীয়।

আমরা দেখলাম চারটি মন্ত্রের কোনোটিতে সকল প্রাণীদের প্রতি হিংসা না করার কথা বলা হয়নি, কোনো বিশেষ প্রাণি হত্যায় নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া হয়নি। এখানে যদি কোনো পশুকে (গাভী, ঘোড়া প্রভৃতিকে) রক্ষা করার কথা বলা হয়ে থাকে, তার কারণ হল এরা বক্তার নিজস্ব সম্পত্তি। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় না যে, গোবধে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । এখানে বরং নিজের সম্পত্তির আওতাভুক্ত পশুদের ছেড়ে অন্যান্য পশুদের হত্যা করার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

কিছু লোক বলেন, জৈমিনি রচিত মীমাংসা দর্শন যাকে পূর্বমীমাংসাও বলা হয়ে থাকে, তাতে যজ্ঞে হিংসা, বলি ইত্যাদি সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দূর করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার তা পড়া উচিত।

এ বিষয়ে আমি বলবো, মীমাংসা দর্শনের উপলব্ধ প্রাচীনতম ভাষ্য শাবরভাষ্যে শবর লিখেছেন, যজ্ঞে যে পশু বিহিত অর্থাৎ যে পশুর যজ্ঞে বিধান আছে, তার সাথে যা করা হয়, তাকে পশুধর্ম বলেঃ সন্তি চ পশুধর্মাঃ- উপাকরণং, উপানয়নং ম অক্ষয়া বন্ধঃ, যূপে নিয়োজনম্, সংজ্ঞপনং, বিশাসনমিত্যেবমাদয়ঃ।[১] অর্থাৎ, পশুধর্ম হল- উপাকরণ (মন্ত্রপূর্বক পশুকে ছোঁয়া), উপানয়ং (পশুকে যূপের কাছে নিয়ে যাওয়া), অক্ষয়া বন্ধঃ (পশুর সামনের ডান পায়ে আর মাথার অর্ধেক স্থানে রশি বাঁধা) , যূপে নিয়োজনং (রশি দিয়ে পশুকে যূপের সাথে বাঁধা), সংজ্ঞপনং (মুখ, নাক প্রভৃতি বন্ধ করে পশুকে হত্যা করা), বিশসনং (মৃত পশুকে কাটা)।

১ মীমাংসাদর্শন ৩/৬/১৮ এর শাবরভাষ্য

এই পশুধর্মের বিধান সবনীয় পশু প্রকরণের চতুর্থ দিনে দেওয়া হয়েছে।

প্রসিদ্ধ আর্যসমাজী বিদ্বান পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক তার 'মীমাংসা শাবরভাষ্যম্' এ লিখেছেন- জৈমিনি সূত্রের এই প্রকরণে এবং অন্যত্রও এমন ঝলক পাওয়া যায় (ভাষ্যতে তো স্পষ্ট বোঝা যায়) যেখানে যজ্ঞে পশুকে হত্যা করে তার অঙ্গের আহুতি দেওয়ার কথা রয়েছে। মীমাংসাসূত্রের আধারভূত গ্রন্থ শাখাপ্রভৃতি এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থের কিছু স্থলে এর স্পষ্ট বিধান পাওয়া যায়।[১]

মীমাংসা দর্শনের সূত্র, শমিতা চ শব্দভেদাত্ (৩/৭/২৮) এর ব্যাখ্যার বিবরণে পণ্ডিত যুধিষ্ঠীর মীমাংসক 'কুতুহলবৃত্তি' পুস্তকের আধারে লিখেছেন – শমিতা তাকে বলা হয় যে ঋত্বিক[২] পশুর মুখ নাক প্রভৃতি বন্ধ করে তাকে হত্যা করে। শমিতা দুই প্রকারের হয়। এক সংজ্ঞপনকর্তা অর্থাৎ মুখ নাক প্রভৃতি বন্ধ করে যে পশুকে হত্যা করে , দুই বিশসিতা অর্থাৎ যে পশুকে কাটে।[৩]

এই সূত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে শাবরভাষ্যে বলা হয়েছে, "ক্লোমা চার্দ্ধং বৈকর্তেনং চ শমিতুঃ। তদ্ ব্রাহ্মণায় দদ্যাত্।" অর্থাৎ ক্লোমা (পশুর অঙ্গবিশেষের নাম) এবং অর্ধেক বৈকর্তন (পশুর অঙ্গ বিশেষের নাম) শমিতার ভাগে পড়ে। তা ব্রাহ্মণকে দিয়ে দাও।

প্রায় একই কথা প্রাচীন গ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭/১) বলা হয়েছে। এর বিবরণে পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক লিখেছেন, "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭/১ এ জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতিতে মৃত পশুর কোন অংশ কোন ঋত্বিক পাবে, এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তাতে এই বচনও কিঞ্চিত পূর্বাপর পাঠভেদে পাওয়া যায়। সায়ণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ক্লোমা শব্দ দ্বারা হৃদয়ের পার্শ্ববর্তী মাংসখণ্ড বোঝায় আর বৈকর্তন দ্বারা অন্য (বাম) স্কন্ধে স্থিত প্রৌঢ় মাংস বোঝায়।"

এর পরে টিপ্পনী করে মীমাংসক মহাশয় লিখেছেন, এটা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ভ্রান্তি দূরকারী। তিনি লিখেছেন, "ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই মৃত পশুর মাংসখণ্ড বন্টন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, ঐতরেয়ের মূল প্রবচন কালে (অর্থাৎ যখন এটা প্রথম লেখা হয়েছিল) অথবা শৌনক দ্বারা এর পুনঃসংস্কারের কালে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞে পশুর বলি দিতেন এবং যজ্ঞশিষ্ট (যজ্ঞের অবশিষ্ট পদার্থ) ভক্ষণ করতেন।"

কেউ একে প্রক্ষেপ বলতে পারেন কিন্তু মীমাংসক মহাশয় একে প্রক্ষেপ (পরবর্তীতে

---

১ মীমাংসা শাবরভাষ্য, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০১৪

২ যজ্ঞের পুরোহিত

৩ মীমাংসা শাবরভাষ্য, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০৭৭

কারো দ্বারা মেশানো) বলে মানেননি। তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করে লিখেছেন, "অথবা এই পশুবলি এবং যজ্ঞীয়মাংসশেষ (যজ্ঞের অবশিষ্ট মাংস) ভক্ষণ পরবর্তীকালে প্রক্ষেপ করা হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রক্ষেপ মনে করার জন্য কোনো সুদৃঢ় প্রমাণ নেই।"[১]

মীমাংসা দর্শনের সূত্র, মাংসং তু সবনীয়ানাং চোদনাবিশেষাত্ (৩/৮/৪৩) এ বলা হয়েছে সবনীয় (যজ্ঞীয়) পুরোডাশ (আহুতির সামগ্রী) মাংসময় হওয়া উচিত।

কাত্যায়ণ শ্রৌতসূত্র (২৪/৫/২০) এবং আপস্তম্ভশ্রৌতসূত্র (২৩/১১/১১) তেও মাংসময় পুরোডাশের বিবরণ মেলে। বস্তুত তাণ্ড্যব্রাহ্মণ নামক এর চাইতে প্রাচীন গ্রন্থে এই ৩৬ বর্ষীয় যজ্ঞের (সত্র) এরকম উল্লেখ আছেঃ এতেন গৌরবীতি শাক্তস্তরসপুরোডাশো যব্যাবত্যাং সর্বামৃদ্ধিমার্ধ্নীত্। (তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ২৫/৭/১) অর্থাৎ, তরসময় (মাংসময়) পুরোডাশযুক্ত 'গৌরবীতি' নামক শাক্ত যব্যাবতী নামক নদীর তটে সত্র সম্পন্ন করে সব প্রকারের সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

আপস্তম্ভশ্রৌতসূত্রে (২৩/১১/১২ এবং ১৩) লেখা আছেঃ

সংস্থিতে সংস্থিতেঅহনি গৃহপতিমৃগয়াং যাতি।
স যান্ মৃগান্ হন্তি তেষাং তরসাঃ পুরোডাশাঃ ভবন্তি।

অর্থাৎ, ৩৬ বর্ষ পর্যন্ত প্রতিদিন যজ্ঞের পরে দিনশেষে যজমান শিকারে যান এবং সে যেসব মৃগকে বধ করেন, তাদের মাংসে পুরোডাশ হয়।

অন্য কথায় এই সত্রে[২] যজমান ৩৬ বছর ধরে মৃগ হত্যা তাদের মাংসকে অগ্নিতে ঝলসিয়ে যান।

উপরে আমরা যজ্ঞের জন্য দুই ধরণের পশুবধ দেখেছি। একটি সংজ্ঞপন, অপরটি শিকারে মৃগ প্রভৃতিকে হত্যা করে যজ্ঞের জন্য আনা। কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতায় তৃতীয় প্রকারের কথা পাওয়া যায়ঃ হৃদয়স্যাগ্রেঅবদ্যতি অথ জিহবায়া অথ বক্ষসঃ। অর্থাৎ, যজ্ঞে ওই পশুর হৃদয় প্রথমে, তারপর মাথা, তারপর জিভ এবং তারপর বক্ষস্থল ছেদন করবেন।

এখানে পশুকে হত্যা করার তৃতীয় বিধি বর্ণনা করা হয়েছে।

আদিশঙ্করাচার্য তার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের শুরুতে অর্থাৎ (১/১/১) প্রথম সূত্রের ভাষ্যে

১ মীমাংসা শাবরভাষ্যম, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০৭৫
২ ৩৬ বর্ষীয় যজ্ঞে)

লিখেছেনঃ যথা চ হৃদয়াবদ্যবদানানামান্নতর্যনিয়মঃ। অর্থাৎ, যেভাবে যজ্ঞে প্রথমের হৃদয়ের ছেদন করা হয়, পরে জিভ প্রভৃতির ছেদন করার নিয়ম আছে...

এখানে উপমা দেওয়ার মাধ্যমে শঙ্করাচার্য উক্ত নিয়মের এক প্রকার সমর্থনই করেছেন । স্পষ্টতই গোহত্যা করার পরে সেই গরুর প্রতি হওয়া হিংসাকে অহিংসাই বলা হয়েছিল। এটা সীমাহীন মিথ্যা এবং নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমার উপর অভিযোগ করা হয়েছে যে আমি নাকি আমার লেখাতে গোমাংস খাওয়ার প্রচার করেছি! একথা সঠিক নয়। আমি আমার লেখার কোথাও গোমাংস খাওয়ার প্রচার করিনি। আমি কেবল লিখেছি যে প্রাচীন ভারতে একসময় গোহত্যা হত এবং আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে গোহত্যা এবং গোমাংসাহারের বিধানও রয়েছে। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর জন্য গোবধ বিষয়টিকে তুলে ধরা উচিত নয় এবং তা দেশের জন্য অহিতকর। আমার এই কথার সাথে প্রত্যেক দেশপ্রেমী বুদ্ধিজীবিরা একমত হবেন।

আমি নিজের লেখায় কোথাও বলিনি যে ইতিহাসের কোনো এক বিশেষ সময়ে হওয়া গোমাংসাহার অথবা গোমেধ (গোবধ) এর প্রথাকে অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত করা উচিত। কোনো ঐতিহাসিক সময়ের আলোচনাত্মক অধ্যয়ণ করা এক কথা , আর তার পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রচার করা অন্য কথা, দ্বিতীয়টির সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

অশ্বমেধ যজ্ঞঃ হিংসা আর অশ্লীলতার তাণ্ডব নৃত্য

ধর্মের ধান্দাবাজেরা সাধারণ মানুষদের লুঠ করার জন্য, রাজনীতি করার জন্য আবারো যজ্ঞকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। যজ্ঞের 'এই' অথবা 'ওই' নাম রেখে ধর্মভীরু মানুষদের আকৃষ্ট করার জন্য বড় বড় আড়ম্বর করা হচ্ছে।

কয়েক বছর আগে ভোপালে অনেক বড় এক যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল। এটাও প্রচার করা হয়েছিল যে এই যজ্ঞ ২৫০০ বছর পর করা হচ্ছে যাতে লোকজন বোকার মত বেশি সংখ্যায় উপস্থিত হয়।

গ্যাস ছড়ানোর কারণে দূষিত হওয়া বায়ুমণ্ডলকে শুদ্ধ করা এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য, এমন বলা হয়েছিল। কিন্তু এই যজ্ঞ করার পাঁচ-ছয় মাস আগে গ্যাস ছড়িয়েছিল এবং যজ্ঞ করার সময় বায়ুতে দূষিত গ্যাসের লেশমাত্রও ছিল না।

এভাবেই হায়দ্রাবাদে বিশ্বশান্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হয়েছিল। ধর্মের ধান্দাবাজেরা ধর্মের নামে কিভাবে মানুষকে বোকা বানায় তার অনুমান এই এক কথায় করা যায় যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে না শান্তি আছে, না এর উদ্দেশ্য কখনো শান্তি স্থাপন করা ছিল।

এই যজ্ঞে অনেক গাছ কেটে বলির পশুকে বাধার জন্য যূপ প্রস্তুত করা হয়, শত শত পশুপাখিকে হত্যা করা হয়, ঘোড়াকে হত্যা করা হয় এবং সৈনিকদের ছত্রছায়ার ছেড়ে দেওয়া যজ্ঞের ঘোড়াকে যে রাজা থামায় তার সাথে যুদ্ধ করা হয়, অর্থাৎ এর সর্বত্র কেবলই অশান্তি। এইজন্যই তো এই দেশের প্রাচীন বুদ্ধিজীবিরা এ বিষয়ে আক্ষেপ করে প্রশ্ন করেছিলেনঃ

বৃক্ষান্ ছিত্বা পশুন্ হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দমম্ ,
যদ্যেবং গম্যতে স্বর্গো নরকঃ কেন গম্যতে।
-পদ্মপুরাণ হতে উদ্ধৃত

অর্থাৎ যদি গাছ কেটে, পশুকে হত্যা করে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তবে নরকের প্রাপ্তি কিভাবে হয়?

তারপরও বিশ্বশান্তির জন্য 'অশ্বমেধ' করা হল।

বামন শিবরাম আপ্তে তার 'দা প্র্যাকটিকাল সংস্কৃত ডিকশনারি' তে অশ্বমেধের অর্থে লিখেছেনঃ অশ্বঃ প্রধানতয়া মেধ্যতে হিংস্যতে অত্র। অর্থাৎ, যেই যজ্ঞে প্রধানত ঘোড়াকে হত্যা করা হয়, তাই হল অশ্বমেধ।

সংস্কৃতের বৃহৎ শব্দকোষ 'শব্দকল্পদ্রুম' এ অশ্বমেধের অর্থ করা হয়েছেঃ যত্র লক্ষণবিশেষাক্রান্তমশ্বং সংপ্রোক্ষ্য কপালে জয়পত্রং বদ্ধা ত্যজেন্। তদ্রক্ষার্থ পুরুষবিশেষং নিয়োজয়েত্ সংবৎসারান্তে অশ্বে আগতে সতি। অথবা কেনাপি সংবদ্ধে যুদ্ধং কৃত্বা তমানীয় যথাবিধি বধং কৃত্বা তদ্ বপয়া হোমঃ কর্তব্যঃ কামনানুসারেণ তৎফলম্ , মোক্ষঃ, ব্রহ্মহত্যাপাপক্ষয়ঃ, স্বর্গশ্চ।

অর্থাৎ এই যজ্ঞে বিশেষ লক্ষণ যুক্ত ঘোড়ার উপর পবিত্রকারী জল মন্ত্রোচ্চারণ করে ছিটিয়ে তার কপালে জয়পত্র বেঁধে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তার রক্ষার জন্য বিশেষ পুরুষকে নিযুক্ত করা হয়। এক বছর পর ঘোড়া ফিরে এলে অথবা সেই ঘোড়াকে কেউ যদি বেঁধে রেখে থাকে তবে তাকে যুদ্ধে হারিয়ে ঘোড়াকে ফিরিয়া আনার পর তাকে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তাকে হত্যা করে তার চর্বি দিয়ে হোম করা হয়। কামনা অনুসারে ফলপ্রাপ্তি হয়ে থাকে- মোক্ষ, ব্রহ্মহত্যার পাপ নাশ করে স্বর্গের প্রাপ্তি।

যেকোনো ব্যক্তি অশ্বমেধ করতে পারে না কেবল রাজাই তা করতে পারে এবং সে রাজাকে ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হতে হয়। অন্য বর্ণের কেউ এই যজ্ঞ করতে পারে না।

প্রায়শ্চিত্তবিবেক[১] বলছেঃ অশ্বমেধপ্রায়শ্চিত্তং তু রাজ্ঞ এব তত্র তস্যৈবাধিকারাত্। অর্থাৎ, পাপনাশের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ কেবল রাজাই করতে পারেন, কেননা তারই এর অধিকার রয়েছে।

ভবিষ্য পুরাণের মত হল যদি ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতাবশত ব্রহ্মহত্যার পাপ করে তবে তার অশ্বমেধ যজ্ঞ করার অধিকার রয়েছেঃ

যদা তু গুণবান্ বিপ্রা হন্যাদ্ বিপ্রং তু নির্গুণম্।
অকামতস্তদা গচ্ছেত্ স্নানং চৈবাশ্বমেধিকম্।।

অর্থাৎ, যদি অনিচ্ছাসত্ত্বে কোনো গুণবান ব্রাহ্মণ কোনো নির্গুণ ব্রাহ্মণকে হত্যা করে তবে সে অশ্বমেধ যজ্ঞে স্নান করবে অর্থাৎ অশ্বমেধ করবে।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অনেকরমের ফলের কথা বলা হয়েছে। যেমনঃ সর্বান্ কামানাপ্স্যন্ <u>সর্বা বিজিতীর্বিজিগীষমাণঃ সর্বা ব্যুষ্টীর্ব্যশিষ্যন্নশ্বমেধেন যজেত। (আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্র</u>

১ ১৪-১৫ শতাব্দী

১০/৬/১) অর্থাৎ, সর্ব পদার্থের ইচ্ছুক, সব জয় করতে অভিলাষী এবং অতুল সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাকারীদের অশ্বমেধ যজ্ঞ করা উচিত।

অনুপাতকিনস্ত্বেতে মহাপাতকিনো যথা, অশ্বমেধেন শুধ্যন্তি।
– বিষ্ণুস্মৃতি ৩৬/৮

অর্থাৎ, ছোটো এবং বড় সব রকমের পাপী অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা শুদ্ধ হয়ে যায়।

তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোহশ্বমেধেন যজতে। -তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫/৩/১২/২

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের হত্যার পাপ অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা দূর হয়ে যায়।

শতপথ ব্রাহ্মণ (১৩/১/৯/৯) বলে অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা বীর পুত্রের জন্ম হয়।

এখানে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো চিহ্নই তো দেখা যাচ্ছে না। জানা নেই হায়দ্রাবাদে কেন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার নামে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে 'নরকে নিয়ে যাওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ' করা হল?

যজ্ঞ বিধির রূপরেখা

প্রাচীন গ্রন্থে অশ্বমেধের যে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়, তা সংক্ষেপে এইরকমঃ হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা এবং উদগাতা নামক চার পুরোহিতের মধ্যে প্রত্যেককে এক এক হাজার করে গরু দান করা হয় এবং তার সাথে একশ বস্তা ভরে স্বর্ণখণ্ড দেওয়া হয়। (কাত্যায়ণ গৃহ্য সূত্র ২০/১/৪-৬) তারপর চারজন পুরোহিত অশ্বের গায়ে ছল ছিটিয়ে তার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। তার সাথে একশ রাজকুমার, একশ উগ্র (যারা রাজা হয় না), সূত (সারথীর কাজ করা এক বর্ণসঙ্কর জাতি) , গ্রামের প্রধান, ক্ষত্র (এক বর্ণসঙ্কর জাতি) এবং সংগ্রহীতা থাকে। চার চোখ ওয়ালা এক কুকুরকে (দুটি চোখ প্রাকৃতিক এবং বাকি দুটি চোখের কাছে বানানো গর্ত) আয়োগব নামক বর্ণসঙ্কর জাতির কোনো বিষয়াসক্ত ব্যক্তি দ্বারা সিধক কাঠের তৈরি মুগুর দিয়ে হত্যা করানো হত। তারপর ঘোড়াকে জলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার পেটের নীচে কুকুরের মৃতদেহকে রশি দিয়ে বেঁধে তাকে প্রস্তুত করা হয়। (আপস্তম্ভ গৃহ্য সূত্র ২০/৩/৬-১৩ , কাত্যায়ন গৃহ্য সূত্র ২২/১/৩৮ , সত্যাষাঢ় শ্রৌতসূত্র ১৪/১/৩০-৩৪) ঘোড়ার আগে আগে একটি ছাগলকে নিয়ে যাওয়া হয়। অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ঘোড়াকে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। তার সাথে চারশ রক্ষক থাকে (যজুর্বেদ ২২/১৯)। এক বছর অবধি ঘোড়া এভাবে ঘুরতে থাকে। যে রাজার রাজ্যে সেই ঘোড়া প্রবেশ করতো সেই রাজ্য যে রাজা

ঘোড়া ছেড়েছে সেই রাজার হয়ে যেত, যদি সেই রাজ্যের রাজা তার বিরোধিতা না করতো। বিরোধিতা করলে যুদ্ধ হত। যে রাজা ঘোড়া ছেড়েছে সে যদি রাজা যুদ্ধে হেরে যেত, তবে যজ্ঞ নষ্ট হয়ে যেত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩/৮/৯) বলছেঃ

পরা বা এষ সিচ্যতে যোঅবলোঅশ্বমেধেন যজতে,
যদমিত্রা অশ্বং বিন্দেরন্ হন্যেতাস্য যজ্ঞঃ ।

অর্থাৎ, যখন অবল ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে তখন তাকে ফেলে দেওয়া হয় অর্থাৎ তাকে হারিয়ে দেওয়া হয়। যদি শত্রু অশ্বকে ধরে ফেলে তবে অশ্বমেধ যজ্ঞ নষ্ট হয়ে যায়।

বছরের শেষে ঘোড়া আবারো অশ্বশালায় নিয়ে আসা হয় এবং একুশটি যূপ দাঁড় করানো হয়, যেখানে অনেক বলির পশুকে বাঁধা হয়। শূকরের মত বন্য পশু এবং পাখিকেও হত্যা করা হয়। (আপস্তম্ভ গৃহ্য সূত্র ২০/১৪/২) কিছু পাখিকে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর অনেক কর্মকাণ্ডের পর ঘোড়াকে মারা হয়। পটরানী মৃত অশ্বের সাথে সম্ভোগ করেন। এই অপ্রাকৃতিক মৈথুনের বিস্তৃত বিবরণ যজুর্বেদের ২৩ অধ্যায়ের উবট এবং মহীধরের ভাষ্যে পাওয়া যায়। এই সম্ভোগ প্রক্রিয়া এতটাই বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করে যে এর বিবরণ দেওয়াও সম্ভব নয়।

হায়দ্রাবাদে হওয়া যজ্ঞে না জানি কার স্ত্রী এই ভূমিকা পালন করেছিলেন!

তারপর পুরোহিত কুমারীদের সাথে এতটা ঘৃণ্য, অশ্লীল কথাবার্তা বলেন যে, কোনো সভ্য ব্যক্তি তা পড়তে পারেন না। যজুর্বেদ (উবট এবং মহীধর ভাষ্য) এর ২৩ অধ্যায়ের ১০ টি পদ্যে এই বার্তালাপের বর্ণনা আছে। আমি এখানে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর পুস্তক ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা থেকে কিছু মন্ত্রের মহীধরোক্ত অর্থ অনুবাদের সাথে অবিকল উদ্ধৃত করতে চাইবো।

১. গণনাং ত্বা গণপতিং হবামহে প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে বসো মম। আহমজানি গর্ভধমা ত্বমজাসি গর্ভধম্। (যজুর্বেদ ২৩/১৯)

ভাষ্যম্ – অস্য মন্ত্রস্য ব্যাখ্যানে তেনাক্তম্- অস্মিন্মন্ত্রে গণপতিশব্দাদশ্বো বাজী গ্রহীতব্য ইতি। তদ্যথা মহিষী যজমানস্য পত্নী যজ্ঞশালায়াং পশ্যতাং সর্বেষামৃত্বিজামশ্বসমীপে শোতে। শায়না সত্যাহ- হে অশ্ব! গর্ভধং গর্ভং দধাতি গর্ভধং গর্ভধারকং রেতঃ, অহম্ আ অজানি আকৃষ্য ক্ষিপামি। ত্বং চ গর্ভধং রেতঃ আ অজাসি আকৃষ্য ক্ষিপসি।

ভাষার্থঃ (গণানাং ত্বা) এই মন্ত্রে মহীধর বলেছেন যে গণপতি শব্দে ঘোড়াকে বোঝানো

হয়েছে। তাই দেখো মহীধরের অর্থ 'সব ঋত্বিকের সামনে যজমানের স্ত্রী ঘোড়ার সাথে শোয় এবং শুয়ে ঘোড়াকে বলে, হে অশ্ব! গর্ভধারণকারী তোর বীর্য টেনে আমি আমার যোনিতে আনি এবং তুই সেই বীর্যকে আমাতে স্থাপন করিস।'[1]

২. তাহউভৌ চতুরঃ পদঃ সম্প্রসারয়াব স্বর্গে লোকে প্রোর্ণুবাথাং বৃষা বাজী রেতোধা রেতো দধাতু। -যজুর্বেদ ২৩/২০

মহীধরস্যার্থঃ- 'অশ্বশিশ্নমুপস্থে কুরুতে বৃষা বাজীতি । মহিষী স্বয়মেবাশ্বশিশ্নমাকৃষ্য স্বযোনৌ স্থাপয়তি'...

ভাষার্থঃ মহিধরের অর্থ- 'যজমানের স্ত্রী ঘোড়ার লিঙ্গ ধরে নিজেই তার যোনিতে প্রবেশ করায়।

৩. যকাসকৌ শকুন্তিকাহলগিনি বঞ্চতি,
আহন্তি গর্ভে পসো নিগল্গলীতি ধারকা। -যজুর্বেদ ২৩/২২

মহীধরো বদতি- ' অধ্বর্য্যাদয়ঃ কুমারীপত্নীভিঃ সহ সোপহাসং সবদন্তে অঙ্গুল্যা যোনিং প্রদেশয়ন্নাহ- স্ত্রীণাং শীঘ্রগমনে যোনৌ হলহলাশব্দো ভবতীত্যর্থঃ (গর্ভে) ভগে যোনৌ শকুনিসদৃশ্যাং যদা পসৌ লিঙ্গমাহন্তি আগচ্ছতি, (পসঃ) পুংস্প্রজননস্য নাম, হন্তির্গত্যর্থঃ যদা ভগে শিশ্নমাগচ্ছতি, তদা (ধারকা) ধরতি লিঙ্গমিতি ধারকা যৌনিঃ (নিগল্গালীতি) নিতরাং গলতি বীর্যং ক্ষরতি, যদ্বা শব্দানুকরণং গগ্ললেতি শব্দং করোতি।'

৪. যকোহসকৌ – যজুর্বেদ ২৩/২৩
'কুমারী অধ্বর্য্যু প্রত্যাহ। অঙ্গুলা লিঙ্গ প্রদেশন্ত্যাহ- অগ্রভাগে সচ্ছিদ্রং লিঙ্গং তব মুখমিব ভাসতে।'

ভাষার্থ- মহীধরের অর্থ- 'যজ্ঞশালায় অধ্বর্যু প্রভৃতি ঋত্বিকেরা কুমারী এবং স্ত্রীদের সাথে উপহাসপূর্বক কথা বলে। এভাবে আঙ্গুল দিয়ে যোনিকে দেখিয়ে হাসে। (আহুলগিতি)। যখন স্ত্রীরা তাড়াতাড়ি চলে, তখন তাদের যোনিতে হলহলা শব্দ হয় এবং যখন যোনিতে লিঙ্গ যুক্ত হয় তখনও হলহলা শব্দ হয় এবং যোনি এবং লিঙ্গ হতে বীর্য পতিত হয়। '

(যকোহসকৌ) 'কুমারী অধ্বর্যুকে উপহাস করে বলে, তোর ছিদ্রযুক্ত লিঙ্গের অগ্রভাগ , তা তোর মুখের মত দেখায়।'

---

১ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ঋগ্বেদাদিভাষ্যম, সং যুধিষ্ঠির মীমাংসক, ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা , পৃষ্ঠা ৩৭৪

৫. মাতা চ তে পিতা চ তেগ্রং বৃক্ষস্য রোহতঃ।
প্রতিলামীতি তে পিতা গর্ভে মুষ্টিমতং সয়ত্।। -যজুর্বেদ ২৩/২৪

মহীধরস্যার্থ- 'ব্রহ্মা মহিষীমাহ- মহিষি হয়ে হয়ে মহিষি! তে তব মাতা চ পুনস্তে তব পিতা যদা বৃক্ষস্য বৃক্ষজস্য কাষ্ঠময়স্য মঞ্চকস্যাগ্রমুপরিভাগং রোহনঃ আরোহতঃ, তদা তে পিতা গভে ভগে মুষ্টিং মুষ্টিতুল্যং লিঙ্গমন্তসয়ত্ তং সয়তি প্রক্ষিপতি। এবং তবোৎপত্তিরিত্যশ্লীলম্। লিঙ্গমুত্থানেনালঙ্করোতি, বা তব ভোগেন স্নিহ্যামীতি বদন্নেবং তবোৎপত্তিঃ।

ভাষার্থ- মহীধরের অর্থ- 'এখন ব্রহ্মা হেসে যজমানের স্ত্রীকে বলে – যখন তোর পিতা খাটের উপর উঠে তোর পিতার মুষ্টিতুল্য লিঙ্গ তোর মাতার যোনিতে প্রবেশ করিয়েছিল, তখন তোর জন্ম হয়েছিল। সে ব্রহ্মাকে বলে, তোর জন্মও এভাবেই হয়েছে, দুজনের জন্মই একই ভাবে হয়েছে।'

৬. ঊর্ধ্বামেনামুচ্ছ্রাপয় গিরৌ ভারং হরন্নিব।
অথাস্যৈ মধ্যমেধতাং শীতে বাতে পুনন্নিব। – যজুর্বেদ ২৩/২৬

মহীধরভাষ্য- 'যথা অস্যৈ অস্যা বাবাতায়া মধ্যমেধতাং যোনিপ্রদেশৌ বৃদ্ধিং যাযাত্, যথা যোনির্বিশালা ভবতি, তথা মধ্যে গৃহীত্বোচ্ছ্রাপয়েত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তান্তরমাহ- যথা শীতলে বায়ৌ বাতি পুনন্ ধান্যপবনং কুর্বাণঃ কৃষীবলো ধান্যপাত্রং ঊর্ধ্বং করোতি তথেত্যর্থঃ।'

৭. যদস্যাঅ অংহুমেদ্যাঃ কৃধু স্থূলমুপাতসত্।
মুষ্কাবিদস্যাঅ এজতো গোশফে শকুলাবিব।। – যজুর্বেদ ২৩/২৮

'যত্ যদা অস্যাঃ পরিবৃক্তায়াঃ কৃধু হ্রস্বং স্থুলং চ শিশ্নমুপাতসত্ উপগচ্ছত্ উপগচ্ছত্ যোনিং প্রতি গচ্ছেত্, তংসং উপক্ষয়ে, তদা মুষ্কৌ বৃষণৌ ইন এব অস্যাঃ যোনেরুপরি এজনঃ কম্পেতে। লিঙ্গস্য স্থূলত্বাদ্ যোনেরল্পত্বাদ্ বৃষণৌ বাহিস্তিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ – গোশফে জলপূর্ণে গোখুরে শকুলৌ মৎস্যাবিব, যথা উদকপূর্ণ গৌঃ পদে মৎসৌ কম্পেতে।'

ভাষার্থ- মহীধরের অর্থ- 'পুরুষেরা স্ত্রীর যোনিকে দুই হাতে টেনে বড় করে নেয়। (যদস্যা অংহু) পরিবৃক্তা অর্থাৎ যে স্ত্রীর বীর্য বের হয়ে যায়, যখন ছোটো এবং বড় লিঙ্গ তার যোনিতে প্রবেশ করানো হয়, তখন যোনির উপর দুই অন্ডকোশ নৃত্য করে, কেননা

যোনি ছোটো হয় এবং লিঙ্গ বড়ো। এখানে মহীধর দৃষ্টান্ত দেয় যে- যেমন গরুর খুর দ্বারা গঠিত গর্তে দুই মাছ নাচে এবং যেমন কৃষক ধান এবং তুষকে আলাদা করার জন্য বায়ুপ্রবাহের মধ্যে এক পাত্রে তা ভরে উপরে উঠিয়ে কাপিয়ে থাকে, সেভাবেই যোনির উপর অন্ডকোষ নেচে থাকে। (৬-৭) (ঐ পৃষ্ঠা ৩৮১-৩৮২)

৮. যদ্দেবাসো ললামগুং প্র বিষ্টীমিনয়াবিষুঃ।
সক্থনা দেদিশ্যতে নারী সত্যস্যাক্ষিভুবো যথা। – যজুর্বেদ ২৩/২৯

মহীধরস্যার্থঃ- '(যত্) যদা (দেবাসঃ) দেবাঃ দীব্যন্তি কীড়ন্তি দেবাঃ হোত্রাদয়ঃ ঋত্বিজো (ললামগুং) লিঙ্গ (প্র আবিশুঃ) যোনৌ প্রবেশয়ন্তি। ললামেতি সুখনাম, ললামং সুখং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ললামগুঃ শিশ্নঃ, যদ্বা ললামং পুণ্ড্রং গচ্ছতি ললানগুঃ লিঙ্গম্, যোনিং প্রবিশদুত্থিতং পুণ্ড্রকারং ভবতীত্যর্থঃ কীদৃশং ললামগুং (বিষ্টীমিনং) শিশ্নস্য যোনিপ্রদেশে ক্লেদনং ভবতীত্যর্থঃ। যদা দেবাঃ শিশ্নক্রীড়িনো ভবন্তি, ললামগুং যোনৌ প্রবেশয়ন্তি, তদা (নারী) (সক্থনা) ঊরুণা ঊরূভ্যাং (দেদিশ্যতে) নির্দিশ্যতে অন্যন্তং লক্ষ্যতে ভোগসময়ে সর্বস্য নার্য্যগস্য নরেণ ব্যাপ্তত্বাদুরুমাত্রং লক্ষ্যতে। ইয়ং নারীতীত্যর্থঃ।'

ভাষার্থ- মহীধরের অর্থ- ' (যদ্দেবাসো) যতক্ষণ পর্যন্ত যজ্ঞশালায় ঋত্বিকেরা হাসাহাসি এবং অন্ডকোষ নাচানোর কাজ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঘোড়ার লিঙ্গ মহিষীর যোনিতে কাজ করে। সেই ঋত্বিকদের লিঙ্গও স্ত্রীদের যোনিতে প্রবেশ করে। আর যখন লিঙ্গ দণ্ডায়মান হয়, তখন কমলের সমান হয়ে যায়। যখন স্ত্রী পুরুষের সমাগম হয়, তখন পুরুষ উপরে এবং স্ত্রী নিচে থাকার জন্য ক্লান্ত হয়ে যায়।

৯. যদ্ধরিণো যবমত্তি ন পুষ্টং পশু মন্যতে।
শূদ্রা যদর্যজারা ন পোষায় ধনায়তি।। – যজুর্বেদ ২৩/৩০

১০. যদ্ধরিণো যবমত্তি ন পুষ্টং বহু মন্যতে ।
শূদ্রো যদর্যায়ৈ জারো ন পোষমনু মন্যতে।। -যজুর্বেদ ২৩/৩১

মহীধরস্যার্থঃ- 'ক্ষত্তা পালাগলীমাহ- শূদ্রা শূদ্রজাতিঃ স্ত্রী, যদা অর্যজারা ভবতি, বৈশ্যা যদা শূদ্রাং গচ্ছতি, তদা শূদ্রঃ পোশায় ন ধনায়তে পুষ্টিং চ ইচ্ছতি, মার্যা বৈশ্যেন ভুক্তা সতী পুষ্টা জাতেতি ন মন্যতে, কিন্তু ব্যভিচারিণী জানেতি দুঃখিতো ভবতীত্যর্থঃ।

(যদ্ধরিণো) পালাগলী ক্ষত্তারমাহ- যত্ যদা শূদ্র অর্যায়ৈ অর্যায়া বৈশ্যায়া জারো ভবতি, তদা বৈশ্যঃ পোষং পুংষ্টি নানুমন্যতে, মম স্ত্রী পুষ্টা জাতেতি নানুমন্যতে,কিন্তু শূদ্রেণ নীচেন ভুক্তেতি ক্লিশ্যতীত্যর্থঃ।

ভাষার্থ- মহীধরের অর্থ- ‘(যদ্ধরিণো) ক্ষত্তা সেবকপুরুষ শূদ্রদাসীকে বলে, যখন শূদ্রের স্ত্রীর সাথে বৈশ্য ব্যভিচার করে, তখন সে তো একথা ভাবে না, আমার স্ত্রী বৈশ্যের সাথে ব্যভিচার করে পুষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু সে একথা ভেবে দুঃখ পায়, আমার স্ত্রী ব্যভিচারিণী হয়েছে।

(যদ্ধরিণো) এখন সে দাসী ক্ষতা কে উত্তর দেয়- যখন শূদ্র বৈশ্যের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে তখন বৈশ্যও একথা ভাবেনা , আমার স্ত্রী পুষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু নীচ ব্যক্তি সমাগম করেছে, এই কথা ভেবে দুঃখ পায়।

১১. উৎসক্থ্যাহঅব গুদং ধেহি সমঞ্জিং চারয়া বৃষন্।
য স্ত্রীণাং জীবভোজনঃ।। – যজুর্বেদ ২৩/২১

মহীধরস্যার্থঃ যজমানোহশ্বমভিমন্ত্রয়তে। হে বৃষন্! সেক্তঃ অশ্ব! উত্ ঊর্ধ্বে সক্থিনো ঊরু যস্যাস্তস্যা মহিষ্যা গুদমব গুদোপরি রেতো ধেহি বীর্যং ধারয়। কথম্? তদাহ অংঞ্জি লিঙ্গং সঞ্চারয় যোনৌ প্রবেশয়। যোহঞ্জিঃ স্ত্রীণাং জীবভোজনঃ। যস্মিন্ লিঙ্গে যোনৌ প্রবিষ্টে স্ত্রিয়ো জীবন্তি ভোগাংশ্চ লভন্তে তং প্রবেশয়।‘

ভাষার্থ- (উৎসক্থ্যা) এই মন্ত্রের টীকায় মহীধর বলেছেন- ‘ যজমান ঘোড়াকে বলে, হে বীর্য সেচনকারী অশ্ব! তুই আমার স্ত্রীর জঙ্ঘাকে উপড়ে তুলে তার মলদ্বারের উপর বীর্য ঢেলে দে, অর্থাৎ, তার যোনিতে লিঙ্গ চালনা কর। সে লিঙ্গ কোন ধরণের যে, যে সময় যোনিতে প্রবেশ করে, সেই সময় সেই লিঙ্গ স্ত্রীদের জীবন হয়, আর তার দ্বারা তারা ভোগ লাভ করে। এর দ্বারা তুই সেই লিঙ্গকে আমার স্ত্রীর যোনিতে প্রবেশ করিয়ে দে।’

হায়দ্রাবাদে হওয়া অশ্বমেধে কুমারীরা কোথা থেকে এসেছিল বা কোথা থেকে তাদের আনা হয়েছিল, তা জানা নেই। ধর্মের নামে মৌখিক কামতৃপ্তির বাধাহীন উৎসব কোন পুরোহিতেরা করেছিল?

তারপর পটরানী অন্যান্য রানীদের সাথে ঘোড়াকে খণ্ড বিখণ্ড করেন। ঘোড়াকে কাটার আগে ‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণ’ এর বিধি অনুসারে তার শরীরে চিহ্ন লাগানো হত যাতে সেই চিহ্ন অনুসারে টুকরো গুলো কাটা যায়। চিহ্নে নির্দিষ্ট টুকরোর বেশি বা তার চাইতে আলাদা রকমের টুকরো যাতে না হয়, তার জন্য ছেদককে চারবার সাবধান করা হত; আজও যারা মুরগী কাটায়, তারা কসাইকে এভাবেই বলে দেন।

ঘোড়ার অঙ্গ কাটার বিধান

ঊষ্মণ্যাপিধানা চরুণামংকাঃ সুনাঃ পরিভূষন্ত্যশ্বম্। ঋগবেদ ১/১৬২/১৩

অর্থাৎ, যে বেতস শাখা দিয়ে অশ্বের অঙ্গকে চিহ্নিত করা হয় আর যে ছুরি দিয়ে চিহ্ন অনুসারে অঙ্গ কাটা হয়, তারা সকলেই অশ্বের মাংসকে প্রস্তুত করে।

ঋগ্বেদের আদি প্রাচীন ব্যাখ্যা গ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিস্তারিত বলা হয়েছে, যজ্ঞে পশুর কোন কোন অঙ্গ কোন কোন ক্রম অনুসারে কাটা উচিত এবং মোট কতগুলি টুকরো করা উচিতঃ

উদীচীনাং অস্য পদো নিধত্তাৎসূর্যং চক্ষুর্গময়তাদ্ বাতং প্রাণমন্ববসৃজতাদন্তরিক্ষমসুং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীরমিত্যেস্বেবৈনং তল্লোকেস্বাদধাতি ইতি। একধাহস্য ত্বচমাচ্ছয়তাত্ পুরা নাভ্যা অপি শসো বপামুৎখিদতাদন্তরেবোষ্মাণং বারয়ধ্বাদিতি পশুষ্বেব তত্ প্রাণান্দধানি ইতি। শ্যেনমস্য বক্ষঃ কৃণুতাত্ প্রশসা বাহু শলা দোষণী কশ্যপেবাংসাহচ্ছিদ্রে শ্রোণী কবষোরু স্রেকপর্ণাহষ্ঠীবন্তা ষড়বিংশতিরস্য বঙ্ক্রয়স্তা অনুষ্ঠ্যোচ্চ্যাবয়তাদ্ গাত্রং গাত্রমস্যানূনং কৃণুতাদ্ ইতি অংগান্যেবাস্য তদ্ গাত্রাণি প্রীণাতি ইতি। ঊবধ্যগোহং পার্থিবং খনতাদিতি... অস্না রক্ষঃ সংসৃজতাদিতি। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬/৬-৭)

অর্থাৎ, ইহার পা উত্তরদিক আশ্রয় করুক, চক্ষু সূর্যকে প্রাপ্ত হউক, প্রাণ বায়ুকে, জীবন অন্তরিক্ষকে, শ্রোত্র দিকসমূহকে ও শরীর পৃথিবীকে আশ্রয় করুক- এই বাক্যে ইহাকে ঐ সকল লোকে স্থাপন করা হয়। ইহার ত্বক একভাবে [অবিছিন্নভাবে] ছিন্ন কর। ছেদনের পূর্বে নাভি হইতে বপা (মেদ) পৃথক কর, প্রশ্বাসকে ভিতরেই নিবারণ কর (শ্বাসরোধ করিয়া বধ কর) – এই বাক্যে পশুসমূহেই প্রাণসকলের স্থাপনা হয়। ইহার বক্ষ শ্যেনের (পক্ষীর) আকৃতিযুক্ত কর (সেইরূপে ছিন্ন কর), বাহুদ্বয় উত্তমরূপে ছিন্ন কর, শ্রোণিদ্বয় অচ্ছিদ্র কর, উরুদ্বয় কবষের (ঢালের) মত ও উরুমূল করবীর পাত্রের মত কর; ইহার পার্শ্বাস্থি ছাব্বিশখানি, সেগুলি পরপর পৃথক কর; সমস্ত গাত্র অবিকল (ছিন্ন) কর – এই বাক্যে ইহার সমস্ত অঙ্গ ও গাত্রকে প্রীত করা হয়।ইহার পুরীষ গোপনের জন্য স্থান (গর্ত) পৃথিবীতে (ভূমিতে) খনন কর।... রুধিরের সহিত রাক্ষসগণের যোজনা কর।[1]

মাংসের বিভাগ

১ অনুবাদকঃ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

এরপর সেই ব্রাহ্মণগ্রন্থ বলির পশুর অঙ্গের বিভাগ এর বিধান সম্বন্ধে বলছেঃ

অথাতঃ পশোর্বিভক্তিস্তস্য বিভাগং বক্ষ্যাম ইতি। হনু সজিহ্বে প্রস্তোতুঃ শ্যেনং বক্ষ উদ্গাতুঃ কণ্ঠঃ কাকুদ্রঃ প্রতিহর্তুর্দক্ষিণা শ্রোণির্হোতুঃ সব্যা ব্রহ্মণো দক্ষিণং সক্থি মৈত্রাবরুণস্য সব্যং ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনো দক্ষিণং পার্শ্বং সাংসমধ্বর্যোঃ সব্যমুপগতাতৃণাং সব্যোংহসঃ প্রতিপ্রস্থাতুর্দক্ষিণং দোর্নেষ্টুঃ সব্যং পোতুর্দক্ষিণ ঊরুরচ্ছাবাকস্য সব্য আগ্নীধ্রস্য দক্ষিণো বাহুরাত্রেয়স্য সব্যঃ সদস্যস্য সদং চানুকং চ গৃহপতের্দক্ষিণৌ পাদৌ গৃহপতের্ব্রতপ্রদস্য সব্যো পাদো গৃহপতের্ভার্যায়ৈ ব্রতপ্রদস্যৌষ্ঠ এনয়োঃ সাধারণো ভবতি তং গৃহপতিরেব প্রশিংষ্যাজ্জাঘনীং পত্নীভ্যো হরন্তি তাং ব্রাহ্মণায় দদ্যুঃ স্কন্ধ্যাশ্চ মণিকাস্তিস্রশ্চ কীকসা গ্রাবস্তুতস্তিস্রশ্চৈব কীকসা অর্ধং চ বৈকর্তস্যোন্নেতুর্ধং চৈব বৈকর্তস্য ক্লোমা চ শামিতুস্তদ্ব্রাহ্মণায় দদ্যাদ্ যদ্যব্রাহ্মণঃ স্যাচ্ছিরঃ সুব্রহ্মণ্যায়ৈ যঃ শ্বঃসুত্যাং প্রাহ তস্যাজিনমিড়া(ল্রা) সর্বেষাং হোতুর্বা ইতি। তা বা এতাঃ ষট্ত্রিংশত্মেকপদা যজ্ঞং বহন্তি ষট্ত্রিংশদক্ষরা বৈ বৃহতী। বাহর্তাঃ স্বর্গা লোকাঃ প্রাণাংশ্চৈব তৎস্বর্গাংশ্চ লোকানাপ্লুবন্তি প্রাণেষু চৈব তৎস্বর্গেষু চ লোকেষু প্রতিতিষ্ঠন্তো যন্তি ইতি।

স এভ স্বর্গ্যঃ পশুর্ এনমেবং বিভজন্তি ইতি। অথ যেহতোন্যথা তদ্ যথা সে- লগা বা পাপকৃতো বা পশুং বিমথনীরংস্তাদৃক্তত্ ইতি। তাং বা এতাং পশোর্বিভক্তিং শ্রৌত ঋষির্দেবভাগো বিদাংচকার তামু হা প্রোচ্যৈবাস্মাল্লোকাদুচ্চক্রামত্ ইতি। তামু হ গিরিজায় বাভ্রব্যায়ামনুষ্যঃ প্রোবাচ ততো হৈনামেতদর্বাঙ্ মনুষ্যা অধীয়তেহধীয়তে ইতি। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ , অধ্যায় ৩১)

অর্থাৎ, অনন্তর পশুবিভাগ, পশুর বিভাগের বিষয় বলিব। জিহ্বাসহিত হনুদ্বয় প্রস্তোতার ভাগ; শ্যেনাকৃতি বক্ষ উদ্গাতার; কণ্ঠ ও কাকুদ্র প্রতিহর্দার ; দক্ষিণ শ্রোণি হোতার; বাম শ্রোণি ব্রহ্মার; দক্ষিণ সক্থি মৈত্রাবরুণের; বাম সক্থি ব্রহ্মণাচ্ছংসীর; অংশসহিত দক্ষিণ পার্শ্ব অধ্বর্য্যুর; বাম পার্শ্ব উদ্গাতাদিগের; বাম অংস প্রতিপ্রস্থাতার; দক্ষিণ দোঃ নেষ্টার; বাম দোঃ পোতার; দক্ষিণ উরু অচ্ছাবাকের; বাম উরু অগ্নাধ্রেয়ের; দক্ষিণ বাহু আত্রেয়ের; বামবাহু সদস্যের; সদ ও অনূক গৃহপতির; দক্ষিণ পদদ্বয় গৃহপতির ব্রতদাতার। ওষ্ঠ উভয় ব্রতদাতার সাধারণ ভাগ; গৃহপতি উহা [দুইজনকে] বিভাগ করিয়া দিবেন। জঘনী পত্নীদিগকে দেওয়া হয়; পত্নীরা তাহা কোনো ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। স্কন্ধস্থিত মণিকা ও তিনখানি কীকস গ্রাবস্তুতের; [অন্য পার্শ্বের আর] তিন খানি কীকস ও বৈকর্ত্তের অর্ধেক উন্নেতার; বৈকর্ত্তের অপরার্ধ ও ক্লোম শমিতার। শমিতা অব্রাহ্মণ হইলে ঐ ভাগ কোনো ব্রাহ্মণকে দান করিবে। মস্তক সুব্রহ্মণ্যাকে দিবে। "শ্ব সুত্যাং" এই নিগদ যিনি পাঠ করেন, সেই আগ্নীধ্রের ভাগ অজিন। আর সবনীয় পশুর যে ইড়াভাগ হইবে, তাহা সর্ব সাধারণের বা একাকী হোতার।

এক এক পদে অভিহিত ঐ অবয়বগুলি এইরূপে ছত্রিশটি ভাগে পরিণত হইয়া যজ্ঞ নির্বাহ করে। বৃহতীর ছত্রিশ অক্ষর; স্বর্গলোক বৃহতীর সম্বন্ধযুক্ত, এতদ্বারা প্রাণ ও স্বর্গলোক লাভ করা যায় এবং এতদ্বারা প্রাণে ও স্বর্গালোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। যাহারা পশুকে এইরূপে বিভাগ করেন তাহাদের পক্ষে সেই পশু স্বর্গের অনুকূল হয়। যাহারা অন্য কোনোরূপে পশুবিভাগ করেন, তাহারা অন্ন কামুক (উদরপরায়ণ) পাপকারীর মত কেবল পশুহত্যা করে কেবল।

পশুবিভাগের এই বিধি শ্রুতের পুত্র দেবভাগ নামক ঋষি জানিতেন; তিনি কাহারো নিকট ইহা প্রকাশ না করিয়াই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। কোনো অমনুষ্য উহা বভ্রুর পুত্র গিরিজকে বলিয়াছিলেন, তাহার পরবর্তী মনুষ্যেরা তদবধি উহা জানিয়া আসিতেছে।[১]

অশ্বকে কাটার সময় ছেদক (পুরোহিত বা কসাই) এর হাতে, নখে যে মাংস লেগে থাকতো, সেগুলো দেবতাদের অর্পণ করা হত। কিছু মাংস রান্না করা হত এবং কিছু মাংস শূলে ঝলসানো হত। আশেপাশের লোকজন সেই গন্ধের প্রশংসা করতেন।

এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পড়া যেতে পারেঃ

এষ ছাগঃ পুরো অশ্বেন বাজিনা পুষ্ণে ভাগো নীয়তে বিশ্বদেব্যঃ।
অভিপ্রিয়ং যত্ পুরোলোশমর্বতা ত্বষ্টেদেনং সোশ্রবসায় জিন্বতি।।
–ঋগবেদ ১/১৬২/৩

অর্থাৎ, সকল দেবতার উপযুক্ত ছাগ পূষারই ভাগে পড়ে, একে দ্রুতগতি অশ্বের সাথে সম্মুখে আনা হচ্ছে। অতএব ত্বষ্টা দেবতাগণের সুভোজনের নিমিত্ত অশ্বের সাথে ঐ অজ হতে সুখাদ্য পুরোডাশ প্রস্তত করুন।

যদশ্বস্য ক্রবিষো মক্ষিকাশ যদ্বা স্বরৌ স্বধিতৌ রিপ্তমস্তি।
যদ্ হস্তয়ৌঃ শামিতুর্যন্নখেষু সর্বা তা তে অপি দেবেষ্বস্তু।।
– ঋগবেদ ১/১৬২/৯

অর্থাৎ, অশ্বের অপক্ক মাংসের যে অংশ মক্ষিকা ভক্ষণ করে, ছেদনকালে বা পরিস্কার করবার সময় ছেদন ও পরিস্কার সাধন অস্ত্রে যা লিপ্ত হয় , ছেদকের হস্তদ্বয়ে এবং নখে যা লিপ্ত থাকে, সে সমস্তই দেবগণের নিকট যাক।

---

১ অনুবাদকঃ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

দেবতাদের নামে

যদুবধ্যমুদরস্যাপবাতি য আমস্য ক্রবিষো গন্ধো অস্তি।
সুকৃতা তচ্ছমিতারঃ কৃণ্বন্তুত মেধং শৃতপাকং পচন্তু।।
– ঋগবেদ ১/১৬২/১০

অর্থাৎ, উদরের অজীর্ণ তৃণ বের হয়ে যায়, অপক্ক মাংসের যে লেশমাত্র থাকে, ছেদনকর্তা তা নির্দোষ করুন এবং পবিত্র মাংস দেবতাগণের উপযোগী করে পাক করুন।

যত্তে গাত্রাদগ্নিনা পচ্যমানাদভি শূলং নিহতস্যাবধাবতি।
মা তদ্ ভুম্যামা শ্রিষন্মা তৃণেষু দেবেভ্যস্তদুশদ্ভ্যো রাতমস্তু।।
– ঋগবেদ ১/১৬২/১১

অর্থাৎ, হে অশ্ব, অগ্নিতে পাক করবার সময়, তোমার গাত্র হতে যে রস বের হয় এবং যে অংশ শূলে আবদ্ধ থাকে তা যেন ভূমিতে পড়ে না থাকে এবং তৃণের সাথে মিশ্রিত না হয়। দেবতারা লালায়িত হয়েছেন, সমস্তই তাদের প্রদান করা হউক।

যে বাজিনং পরিপশ্যন্তি পক্বং যে ইমাহুঃ সুরভির্নির্হরেতি।
যে চার্বতো মাংসভিক্ষামুপাসত উতো নেষামভিগুর্তির্ন ইন্বতু।।
– ঋগবেদ ১/১৬২/১২

অর্থাৎ, যারা চারিদিক হতে অশ্বের পাক দর্শন করে, যারা বলে এর গন্ধ মনোহর হয়েছে, এখন নামাও এবং যারা মাংস ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করে, তাদের সংকল্প আমাদের সংকল্প হোক।

এভাবে ঘোড়াকে কেটে, রান্না করেও বলা হত ঘোড়া মরে নি, সে স্বর্গে দেবতাদের কাছে গিয়েছেঃ

ন বা উ এতন্ ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবাং ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ
– ঋগবেদ   ১/১৬২/২১

অর্থাৎ, হে অশ্ব! তুমি মরছ না অথবা লোকে তোমার হিংসা করছে না, তুমি উত্তম পথে দেবতাগণের নিকট যাচ্ছ।

সব কিছু সমাপ্ত করে ঘোড়ার কাছে অর্থাৎ অশ্বমেধ থেকে ধন, পুত্র এবং শারীরিক বলের কামনা করা হতঃ

সুগব্যং তো বাজী স্বশ্ব্যং পুংসঃ পুত্রান্ উত বিশ্বাপুষং রয়িম্।
অনাগাস্ত্বং ত অদিতিঃ কৃণোতু ক্ষত্রং তো অশ্বা বনতাং হবিষ্মান্।।
– ঋগবেদ ১/১৬২/২২

অর্থাৎ, এ অশ্ব, আমাদের গো ও অশ্ববিশিষ্ট জগৎপোষক ধন প্রদান করুক, আমাদের পুরুষ অপত্য দান করুক। তেজস্বী অশ্ব আমাদের পাপ হতে বিরত করুক। হবির্ভূত অশ্ব আমাদের শারীরিক বল প্রদান করুক।

এই যজ্ঞে অনেক দান করা হত। প্রথম এবং শেষ দিনে এক হাজার গরু এবং দ্বিতীয় দিন রাজ্যের কোনো এক জেলায় বসবাসকারী সকল অব্রাহ্মণদের সম্পত্তি দান করে দেওয়ার বিধান ছিল। বিজীত দেশের পূর্ব ভাগের সম্পত্তি হোতার , উত্তর ভাগ উদ্গাতার, পশ্চিম ভাগ অধ্বর্যুর, দক্ষিণ ভাগ ব্রহ্মা এবং তাদের সহায়কদের দেওয়ার বিধান ছিল। যদি এত দান করা সম্ভব না হত, তাহলে চার পুরোহিতকে ৪৮ হাজার গরু, প্রধান পুরোহিত এর তিন সহায়ককে ২৪ হাজার, ১২ হাজার এবং ৬ হাজার গরু দান করা হত। (ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস, ১, পৃষ্ঠা ৫৬৯)

বাল্মীকি রামায়ণে দশরথের করা অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ যায়। বালকাণ্ডে তাকে পুত্রের কামনায় এই যজ্ঞ করতে দেখা যায়। এই যজ্ঞে এক বছর পর্যন্ত ঘোড়াকে ঘোরানোর পর ফেরত আনা হয়েছিল এবং সরযূ নদীর তীরে যজ্ঞ করা হয়েছিলঃ

অথ সংবৎসরে পূর্ণে তস্মিন্ প্রাপ্তে তুরংগমে।
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে রাজ্ঞো যজ্ঞোহভ্যবর্তন।। ১
ঋষ্যশৃংগং পুরস্কৃত্য কর্ম চক্রুর্দ্বিজর্ষভাঃ।
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে রাজ্ঞোস্তস্য সুমহাত্মনঃ।। ২
নিযুক্তাস্তত্র পশাবস্তত্তদুদ্দিশ্য দৈবতম্।
উরগা পক্ষিণশ্চৈব যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ।।৩০
শামিত্রে তু হয়স্তত্র তথা জলচরাশ্চ যে।
ঋষিভিঃ সর্বমেবৈতন্নিযুক্তং শাস্ত্রতস্তদা।। ৩১
পশুনাং ত্রিশতং তত্র যুপেষু নিয়তং তদা।
অশ্বরত্নোত্তমং তত্র রাজ্ঞো দশরথস্য চ।। ৩২
কৌসল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য সমন্ততঃ।
কৃপাণৌর্বিশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা।। ৩৩

পত্রৎত্রিণা তথা সার্ধং সুস্থিতেন চ চেতসা।
অবসদ্ রজনীমেকাং কৌসল্যা ধর্মকাম্যয়া।। ৩৪
হোতাধ্বর্যুস্তথোদ্গাতা হয়েন সমযোজয়ন্।
মহিষ্যা পরিবৃত্ত্যাথ বাবাতামপরাং তথা।। ৩৫
পতৎত্রিণস্তস্য বপামুদ্ধৃত্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
ঋত্বিক্পরমসম্পন্নঃ শ্রপয়ামাস শাস্ত্রতঃ।। ৩৬
ধুমগন্ধং বপায়াস্তু জিঘ্রতি স্ম নরাধিপ।
যথাকালং যথান্যায়ং নির্ণুদন্ পাপমাত্মনঃ।। ৩৭
হয়স্য যানি চাংগানি তানি সর্বাণি ব্রাহ্মণাঃ।
অগ্নৌ প্রাস্যন্তি বিধিবত্ সমস্তাঃ ষোড়শর্ত্বিজঃ।। ৩৮
-বালকাণ্ড, সর্গ ১৪

অর্থাৎ, তারপরে এক বছর সম্পন্ন হলে ঘোড়া ফিরে এল এবং সরযূ নদীর উত্তর তীরে রাজার যজ্ঞ আরম্ভ হল। (১) মহাত্মা রাজা (দশরথ) র অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ঋষ্যশৃঙ্গ কে নিজেদের প্রধান বানিয়ে যজ্ঞকর্ম করতে লাগলেন। (২) ... পশু, পক্ষী এবং সাপ, যাদের রাখার অনুমতি শাস্ত্র দেয় তাদের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের নামে সেখানে রাখা হল। (৩০) ঋষিরা যজ্ঞে বধ করার জন্য ঘোড়া এবং জলচর প্রাণীদের যূপের সাথে বাধলেন। (৩১) সেই যজ্ঞে তিনশত পশু যূপের সাথে বাঁধা হয়েছিল। রাজা দশরথের সেই শ্রেষ্ঠ ঘোড়াকেও (যে পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে এসেছিল) বাঁধা হয়েছিল। কৌশল্যা খুশিমনে অশ্বের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে তলোয়ারের তিন কোপে তাকে হত্যা করেছিলেন। (৩৩) কৌশল্যা ঐ মৃত ঘোড়ার পাশে সাবধানচিত্ত হয়ে ধর্মের কামনা করে এক রাত অবস্থান করেছিলেন। (৩৪) তারপর হোতা, অধ্বর্যু এবং উদগাতা মহিষী (যে রানির রাজার সাথে রাজ্যাভিষেক হয়েছিল), পরিবৃক্তি (রাজার শূদ্র জাতীয় পত্নী) এবং বাবাতা (রাজার বৈশ্য জাতীয় পত্নী) এই তিন শ্রেণীর রানিদের ঘোড়ার সাথে যুক্ত করেছিলেন। (৩৫) জিতেন্দ্রিয় এবং শ্রৌতকর্মে কুশল ঋত্বিক (পুরোহিত) ঐ ঘোড়ার চর্বি বের করেছিলেন এবং শাস্ত্রানুসারে তা রান্না করেছিলেন। (৩৬) রাজা দশরথ সেই হবনকৃত চর্বির গন্ধ উপযুক্ত সময়ে বিধান অনুসারে শুঁকেছিলেন, যার ফলে তার পাপ দূর হয়ে গিয়েছিল। (৩৭) ষোল জন ঋত্বিক ব্রাহ্মণেরা মিলে ওই ঘোড়ার যত অঙ্গ ছিল, সব গুলোকে অগ্নিতে হবন করেছিলেন।

মহাভারতে অশ্বমেধ

মহাভারতের অশ্বমেধিক পর্বে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, অশ্বমেধের ফলে সমস্ত পাপ দূর হয়ে যায়। মহাভারতের যুদ্ধে বিশাল নরসংহারের ফলে পাণ্ডবদের যে পাপ হয়েছিল, সেই পাপ দূর করার জন্য যুধিষ্ঠির এই

যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনশ পশুর বলি দেওয়া হয়েছিল এবং ঘোড়ার চর্বি দিয়ে আহুতি দেওয়া হয়েছিল।

যজস্ব বাজিমেধেন বিধিবত্ দক্ষিণাবতা।। ১৫
অশ্বমেধো হি রাজেন্দ্র পাবনঃ সর্বপাপ্মনাম্।
তেনেষ্ট্বা ত্বং বিপাপ্মা বৈ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ।। ১৬
অশ্বমেধিকপর্ব, অধ্যায় ৭১

অর্থাৎ, ব্যাস বলেছেন, "হে যুধিষ্ঠির, বিধি পূর্বক দক্ষিণা দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। রাজেন্দ্র, অশ্বমেধ যজ্ঞ সমস্ত পাপ নাশ করে যজমানকে পবিত্র করে। এর অনুষ্ঠান করে তুমি পাপমুক্ত হবে, এতে সংশয় নেই।"

ততো নিযুক্তাঃ পশবো যথাশাস্ত্রং মনীষিভিঃ।
তং তং দেবং সমুদ্দিশ্য পক্ষিণঃ পশবশ্চ যে।।
ঋষভাঃ শাস্ত্রপঠিতাস্তথা জলচরাশ্চ যে।
সর্বাস্তানভ্যযুংজংস্তে তত্রাগ্নিচযকর্মণি।।
যুপেষু নিয়তা চাসীত্ পশুনাং ত্রিশতী তথা।
অশ্বরত্নোত্তরা যজ্ঞে কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ।।
-অশ্বমেধিকপর্ব ৮৮/৩৩-৩৫

অর্থাৎ, এরপর মনিষী ঋত্বিকেরা শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পশুদের নিযুক্ত করলেন। ভিন্নভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে পশু, পাখি এবং শাস্ত্রকথিত বৃষভ এবং জলচর জন্তু- এদের অগ্নিস্থাপন কার্যে যাজকেরা ব্যবহার করলেন। কুন্তীনন্দন মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই যজ্ঞে যে সব যূপ দাঁড় করানো হয়েছিল, তাতে তিনশত পশু বাঁধা হয়েছিল। এসবের মধ্যে প্রধান সেই অশ্বরত্ন ছিল।[১]

শ্রপয়িত্বা পশুনন্যান্ বিধিবদ্ দ্বিজসত্তমাঃ।
তং তুরংগং যথাশাস্ত্রমালভন্ত দ্বিজাতয়ঃ।। ১
ততঃ সংশ্রপ্য তুরংগং বিধিবদ্ যাজকাস্তদা।
উপসংবেশয়ন্ রাজংস্ততস্তাং দ্রুপদাত্মজাম্।। ২
উদ্ধৃত্য তু বপাং তস্য যথাশাস্ত্রং দ্বিজাতয়ঃ।। ৩
শ্রপয়ামাসুরব্যগ্রা বিধিবদ্ ভরতর্ষভ।
তং বপাধুমগন্ধং তু ধর্মরাজঃ সহানুজৈঃ।। ৪
উপাজিঘ্রদ্ যথাশাস্ত্রং সর্বপাপাহং তদা।

১ মহাভারত, খণ্ড ৬, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, হিন্দি অনুবাদ সহিত, পৃষ্ঠা ৬২৯০

শিষ্টান্যংগানি যান্যাসংস্তস্যাশ্বস্য নরাধিপ।। ৫
তান্যগ্নৌ জুহুবুর্ধীরাঃ সমস্তাঃ ষোড়শর্ত্বিজঃ।। ৬
- অশ্বমেধিক পর্ব ৮৯

অর্থাৎ, সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য পশুদের বিধিপূর্বক রান্না করে ওই অশ্বকেও শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে বধ করলেন। (১) রাজন, তারপর যাজকেরা বিধিপূর্বক অশ্বকে রান্না করে তার কাছে দ্রৌপদীকে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে বসালেন। (২) হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তারপর ব্রাহ্মণেরা শান্তচিত্ত হয়ে সেই অশ্বের চর্বি বের করে তাকে বিধিপূর্বক রন্ধন করা শুরু করলেন। (৩) ভাইদের সাথে যুধিষ্ঠির শাস্ত্রোক্ত আজ্ঞা অনুসারে সমস্ত পাপনাশক সেই চর্বির ধোয়ার গন্ধ শুঁকেছিলেন। (৪) নরেশ্বর, ওই অশ্বের যে শেষ অঙ্গ ছিল তা দিয়ে শান্ত স্বভাবের ষোল জন ঋত্বিকেরা অগ্নিতে হোম করেছিলেন। (৫) [১]

এটা স্পষ্ট যে, অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রচুর হত্যাকাণ্ডের বিধান ছিল। এইজন্য অনেক লোকেরা আজ এসবে লজ্জিত হয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এবং হিন্দু ধর্মের এসব ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য অনেক রকমের পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে চার রকমের পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

প্রথম পদ্ধতিটি হল- বামমার্গীদের ঘাড়ে দোষ চাপানো। বলা হয় বামমার্গীরা আমাদের ধর্মগ্রন্থে এই ধরণের ভ্রান্ত কথা মিশিয়েছিলেন। এই কথাটি একেবারেই শিশুসুলভ। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে বামমার্গীরা নিজেদের কাছে থাকা সেইসব গ্রন্থে তো নিজেদের কথা মেশাতে পারে, কিন্তু হিন্দুদের ঘরে এবং মঠে সুরক্ষিত থাকা পুঁথিতে তারা কিভাবে নিজেদের কথা মেশালেন? আজ যতগুলো কপি পাওয়া যায়, এর সবকটিতে এই কথাগুলো আছে। সব কপিই কি তাহলে বামমার্গীদের কাছে ছিল? বামমার্গীরা যখন এসব মেশাচ্ছিলেন তখন হিন্দুরা কি করছিলেন? তাদের কাছে নিজেদের গ্রন্থের একটি কপিও কেন ছিল না?

দ্বিতীয়ত, শতাব্দীর পর শতাব্দী কোনো হিন্দু, বিদ্বান, ধর্মগুরু অথবা আচার্যরা কেন এইসব কথাকে বামমার্গীদের মেশানো বলে দাবী করেননি?

প্রাচীন সময়ের বুদ্ধিবাজীবিরা সময়ে সময়ে এইসব অনর্থক প্রথার উপর আক্রমণ করেছিলেন। সর্বদর্শনসংগ্রহে (১৪ শতাব্দী) উদ্ধৃত একটি শ্লোকে বলা হয়েছেঃ

অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নং তু পত্নীগ্রাহয়ং প্রকীর্তিতম্।
ভংডৈস্তদ্বদ্ পরং চৈব গ্রাহয়জানং প্রকীর্তিতম্।।

---

১ মহাভারত, ষষ্ঠ খণ্ড, গীতাপ্রেস, গোরখপুর, হিন্দি অনুবাদ সহিত, পৃষ্ঠা ৬২৯০-৬১৯১

অর্থাৎ, ভাঁড়েরা বলে, পত্নীদের ঘোড়ার লিঙ্গ গ্রহণ করা উচিত। তারা লিখেছেন, এভাবে অনেক কিছুই গ্রহণ করার যোগ্য।

সেই যুগে যখন এমন যজ্ঞ প্রায়শই হত, বুদ্ধিজীবিরা এইধরণের বিধান দেওয়া 'ঐশ্বরিক' বেদকে 'প্রতারকদের বাণী' বলে অভিহিত করেছিলেন এবং কেউ তাদের এর উত্তর প্রদান করেননি। তখন থেকে এখন পর্যন্ত, শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে অনেক বড় বড় গ্রন্থ লেখা হয়েছে কিন্তু এই শ্লোকের কোনো উত্তর কেউ দেননি। মহীধর যজুর্বেদের ভাষ্য পরে লিখেছিলেন। যদি বুদ্ধিজীবিদের কথা মিথ্যে হত তাহলে তিনি নিজের বেদভাষ্যে অন্য কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারতেন কিন্তু তিনি নিজেও একই কথা লিখেছিলেন।

সমগ্র হিন্দু ধার্মিক সাহিত্যের কোথাও অশ্বমেধের হিংসা, অশ্লীলতা এবং অনর্থক কথাগুলোকে অস্বীকার করা হয়নি, এগুলোকে বামমার্গীদের কথা বলেও অভিহিত করা হয় নি। আধুনিককালে যারা বামমার্গীদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন, তাদের কথা একেবারেই ভিত্তিহীন।

স্পষ্টতই, হিন্দুরাই এইসব গ্রন্থ লিখেছিল, বামমার্গীরা এসবে কোনো কথা মেশায়নি ।আজকে এসবকে আড়াল করবার যে প্রচেষ্টা চলছে, এর কারণ হল বর্তমান সভ্যতার আদিম ধর্মসংস্কারগুলো নিয়ে লজ্জা এবং ধর্মসংস্কারগুলোর প্রতিপাদক ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থকে মোহবশত আঁকড়ে ধরে থাকার মনোবৃত্তি । এর শিকার যে সকল ব্যক্তি, তারা কোনো ভিত্তি ছাড়াই প্রাচীন ধর্মগ্রন্থকে পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে থাকেন। পড়াশোনা না করেই যেহেতু তারা এই মত পোষণ করে থাকেন, তাই যখন প্রাচীন আপত্তিকর কথা তারা প্রমাণ সহ দেখতে পান, তখন তারা এর জন্য বিধর্মীদের দোষারোপ করে নিজেদের মান বাঁচাতে চান এবং ধর্মগ্রন্থকে নির্দোষ দেখাতে চান। কিন্তু এইসব প্রলাপের মাধ্যমে ইতিহাস বদলে যায় না বরং ইতিহাস বিষয়ে মিথ্যবাদীদের অজ্ঞতাই প্রকাশিত হয়।

এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ আর্যসমাজী বিদ্বান যুধিষ্ঠির মীমাংসক তার মীমাংসাশাবরভাষ্যের টীকায় যা বলেছেন তা দ্রষ্টব্যঃ

"ঐতরেয় ব্রাহ্মণে হত্যা করা পশুর মাংসের বিভাগ থেকে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট যে ,ঐতরেয়ের মূল প্রবচন কালে অথবা শৌনক দ্বারা এর পুনঃসংস্কারের কালে যজ্ঞে পশুবলি হত এবং ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞশিষ্ট প্রসাদরূপ মাংসের ভক্ষণ করতেন অথবা এই পশুবলি এবং যজ্ঞীয়মাংসশেষ এর ভক্ষণ উত্তরকালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু প্রক্ষীপ্ত মনে করার মত কোনো সুদৃঢ় প্রমাণ নেই।"[১]

---

১ মীমাংসা শাবরভাষ্যম, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০৭৫

দ্বিতীয় পদ্ধতি হল শব্দের অর্থ বদল করা। বলা হয়ে থাকে, অশ্বমেধে যে 'অশ্ব' শব্দ রয়েছে, এর অর্থ ঘোড়া নয় বরং অশ্বগন্ধা নামক গাছ। সেই গাছই অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় হবনকুন্ডে নিক্ষেপ করা হত, যার সুগন্ধে দেবতারা প্রসন্ন হতেন এবং জীবাণু নষ্ট হয়ে যেত। এর ফলে প্রজারা সুস্থ এবং সুখী হয়ে উঠতেন।

আমাদের প্রশ্ন হল- অশ্বমেধের সময় দিগ্বিজয়ের জন্য রাজারা সৈনিকদের তত্ত্বাবধানে যে 'অশ্বকে' ছাড়তেন, সেটাও কি ঘোড়া নয়, অশ্বগন্ধা নামক লতামাত্র যাকে কোনো চাকরেরর মাথার উপরের ঝুড়িতে রেখে এক বছর ঘোরানো হত?

যদি সেটা গাছই হত, তাহলে তাকে যূপে বেঁধে তলোয়ার দিয়ে কেন কাটা হত? তাকে কি সরাসরি উঠিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা যেত না?

তারপর ব্রাহ্মণগ্রন্থে 'অশ্বের' ছত্রিশটি টুকড়ো করার বিধান রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে চোয়াল কাকে দিতে হবে, হাত কাকে দিতে হবে, লেজ কার জন্য, উপরের ঠোঁট কার জন্য, ঘাড়ের অংশ কার। এসব অঙ্গ কি একটি গাছের থাকতে পারে?

আবার যজুর্বেদের মন্ত্রে তো পটরানীর দ্বারা ঘোড়ার বীর্য নিক্ষেপকারী লিঙ্গকে টেনে নিজের যোনিতে প্রবেশ করানোর বিধান রয়েছে। অশ্বগন্ধা গাছেরও কি লিঙ্গ আছে, সেও কি বীর্য ছাড়তে পারে?

যেমনটা প্রথমে লিখেছিলাম, প্রাচীন বুদ্ধিজীবিরা পটরানীর ঘোড়ার লিঙ্গ গ্রহণের নিন্দা করেছিলেন। যদি অশ্ব এর জায়গায় অশ্বগন্ধার অশ্বমেধ করা হত, তাহলে বুদ্ধিজীবিরা 'পত্নীর ঘোড়ার লিঙ্গ গ্রহণের বিধানকে' কেন আক্রমণ করতেন? এর কি প্রয়োজন ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর সমগ্র হিন্দু সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। বর্তমানের কিছু গোঁজামিলবাজরাই তাদের কপোলকল্পিত নানা ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।

স্বামী করপাত্রীজী মহারাজ তো গাছ হওয়ার সমস্ত রকমের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে যজ্ঞে পশুহত্যার কথা বলেছেন এবং তাদের মৃত্যুকে তাদের জন্য লাভদায়ক বলে লিখেছেন, "যজ্ঞে করা পশুবধ পশুদের স্বর্গে নিয়ে যায় এবং তারা পশুযোনি ত্যাগ করে দিব্য শরীর লাভ করে, ফলে পশুর উপকারই হয়ে থাকে। ... সেই যজ্ঞীয় পশুরা অপকৃষ্ট যোনি থেকে মুক্ত হয়ে দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।" (বেদার্থপরিজাত, ভাগ ২, পৃষ্ঠা ১৯৭৭-১৯৭৮)

দ্বিতীয়ত, আপস্তম্ভ কল্পসূত্রে বলা হয়েছেঃ
অশ্বালম্ভ্যং গবালম্ভং সংন্যাসং পলপৈতৃকম।

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েত্।।

অর্থাৎ, অশ্বমেধ, গোমেধ, সন্ন্যাস, শ্রাদ্ধে মাংস প্রদান করা এবং দেবর দ্বারা নিয়োগের মাধ্যমে পুত্র উৎপন্ন করা- এই পাঁচ জিনিস কলিযুগে করা উচিত নয়।

এভাবেই বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলা হয়েছেঃ

নরমেধাশ্বমেধকৌ গোমেধমখং তথা ইমান্।
ধর্ম্মান কলিযুগে বর্জ্যানাহুঃ মনীষিণঃ।।

অর্থাৎ, নরমেধ, অশ্বমেধ তথা গোমেধ যজ্ঞ- এসব ধর্মকার্যকে বিদ্বানেরা কলিযুগে নিষিদ্ধ বলেছেন।

অশ্বমেধের অশ্বের অর্থ যদি ঘোড়া না হয়ে গাছ হত তাহলে এসব অর্বাচীন গ্রন্থ্ কেন কলিযুগে এদের নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিল? এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হল বৌদ্ধরা যজ্ঞে হওয়া অনর্থক হিংসার তীব্র বিরোধীতা করেছিল। এর ফলে যজ্ঞের ওকালতি করা পুরোহিতদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের এসব যজ্ঞের নিন্দাই করতে হয়েছিল।

তৃতীয় যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা খুবই বিচিত্র। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সাথী পণ্ডিত ভীমসেন শর্ম, যিনি পরবর্তীকালে সনাতন ধর্মের নেতা হয়েছিলেন, তিনি লিখেছেন “বেদভাষ্যকার মহীধরের লেখা অনুসারে এইসব মন্ত্রের অর্থ কাউকে (সংস্কৃত এবং লোকভাষাতে) কোনো যজ্ঞের সময় এবং অন্যত্র বলা উচিত নয়... মহীধরেরও এমন অভিপ্রায় কখনোই ছিল না যে, যজ্ঞের সময় এবং অন্যত্র এই অর্থ বলা হোক... কিন্তু মহীধরেরও এই মত যে, এমন অর্থ কোথাও বলার যোগ্য নয়। কেবল বেদাধিকারী শুদ্ধ পুরুষ ওই মন্ত্রের অর্থ জানতে চাইলে এই সংস্কৃত ভাষ্য থেকে তারা জানতে পারেন। ... যেহেতু এই অর্থ অবাচ্য (বলার অযোগ্য) তাই একে বলা আমিও উচিত মনে করি না কিন্তু যজ্ঞ এবং স্বাধ্যায় প্রভৃতির সময় কেবল মন্ত্র বাচ্য (পড়া এবং বলার যোগ্য) ” (পণ্ডিত ভীমসেন শর্মা, আশ্বমেধিক মন্ত্রমীমাংসা ১৯১১ ইং, পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯)

মানে তারা বলছেন, অর্থ তো ঠিক আছে, কিন্তু এই অর্থ বলা উচিত নয়, কেবল মন্ত্রটি তোতার মত পড়া উচিত। অর্থকে কেবল বেদাধিকারী বিদ্বান নিজের স্বাধ্যায় এর জন্য পড়তে পারেন, তবে কাউকে বলতে পারেন না।

এর থেকে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে অশ্বমেধে হত্যাকাণ্ড এবং অশ্লীল কর্ম হওয়ার কথা এরাও স্বীকার করেন, কিন্তু জনসাধারণ এর অর্থ জানুক, তারা এটা চান না,

কেননা তারা যদি এসব জেনে যায় তাহলে তাদের বেদশাস্ত্র থেকে বিশ্বাস উঠে যাবে। তাহলে এসবের নামে যেসব ব্যবসা চলছে সেসব কিভাবে চলবে?

এখানে পণ্ডিত ভীমসেন শর্মা এইসব অর্থ বলা, শোনায় নিষেধ করে এটা স্বীকার করে নিয়েছেন, যা অর্থ করা হয়েছে তা ঠিকই আছে । উনি কিন্তু এটা বলেননি যে এইসব অর্থ বিধর্মীরা করেছে বা এসব প্রক্ষিপ্ত।

এইজন্য প্রাচীন বুদ্ধিবাদীরা বলেছিলেনঃ

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ।।
-সর্বদর্শনসংগ্রহ থেকে উদ্ধৃত

অর্থাৎ, আচার্য বৃহস্পতি বলেছেন, অগ্নিহোত্র আদি যজ্ঞ, তিন বেদ, ত্রিদণ্ড, শরীরের ভস্ম মাখা এসব বুদ্ধি এবং পৌরুষহীন লোকেদের জীবিকার উপায়।

চতুর্থ পদ্ধতি হল- ছদ্ম বিজ্ঞানের আশ্রয় নেওয়া। কিছু লোক কপোলকল্পিত বৈদিক বিজ্ঞানের নামে এসব অসভ্যতাকে আজও সিদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এক সনাতনী পণ্ডিত লিখেছেন, যাজ্ঞিক অশ্বের রুধির দুধে রূপান্তরিত হয়ে যেত এবং শরীর কর্পূর হয়ে যেত। গর্ভাশয় কে শুদ্ধ করার জন্য অশ্বের কর্পূরে রূপান্তরিত হওয়া চর্বিকে বিধি অনুসারে আগুনে নিক্ষেপ করলে যে ধোঁয়া উঠতো, যজমান পত্নী সেই ধোয়া দিয়ে নিজের গর্ভাশয়ে লাগাতেন। এইজন্য এক রাত যজমান পত্নী একা মৃত অশ্বের কাছে থাকতেন। বস্তুত যজমানের পত্নীর গর্ভাশয়ের বিষাক্ত অবস্থাকে দূর করার জন্য এটা একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছিল।" (কিউ? (উত্তরার্ধ) পৃষ্ঠা ৮৭৮ এবং ৮৮০)

অন্য একজন পণ্ডিত লিখেছেন, রানীর গর্ভাশয়কে শুদ্ধ করার জন্য অশ্বমেধের ঘোড়ার পৃথক করা অঙ্গ (অর্থাৎ, কেটে ফেলা লিঙ্গ) থেকে তৈরি করা পদার্থকে রানী নিজের অঙ্গে (নিজের যোনিতে) প্রবেশ করাতেন। এর ফলে স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বদোষ দূর হয়ে যেত। আবার ওই অশ্বের অঙ্গ হবন করার ফলে- তা মন্ত্রবলে অদ্ভুত শক্তিযুক্ত এবং সুগন্ধযুক্ত হয়ে যেত। এই সূক্ষ্ম অঙ্গের গন্ধ রাজা-রানী শোঁকার ফলে তা তাদের ভিতরে প্রবেশ করে তাদের শুক্র এবং যোনির দোষ দূর করতো। (শ্রীসনাতনধর্মশ্লোক, ভাগ ৬, পৃষ্ঠা ৪১০-৪১১)

এসব ব্যাখ্যা অপবিজ্ঞানের মোড়কে অসভ্যতাকে ঢেকে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের নাম নিয়ে লোকজনকে নিজেদের জালে ফাঁসানো। এর জন্যই

দুইজন পণ্ডিতের কল্পিত এবং নির্লজ্জ ব্যাখ্যার একটি অন্যটির সাথে মেলে না। একজন বলছেন, মন্ত্রের প্রভাবে ঘোড়ার অঙ্গ যখন কর্পূরে রূপান্তরিত হয়ে যেত, তখন তা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে অগ্নি থেকে ওঠা ধোঁয়া যজমান পত্নী তার যোনিতে লাগাতেন। অন্যদিকে দ্বিতীয়জন বলছেন, ঘোড়ার লিঙ্গ কেটে তৈরি পদার্থ রানী নিজের যোনিতে প্রবেশ করাতেন এবং ঘোড়ার অঙ্গ হবন করার ফলে যে ধোঁয়া উঠতো, তা শোঁকার ফলে বীর্য এবং যোনির দোষ দূর হয়ে যেত।

এসব প্রলাপের ভিত্তি ঠিক কি? কোন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে এই বিধান রয়েছে? সুশ্রুত এটা বলেছেন, না চরক বলেছেন? শুধু তাই নয়, ধার্মিক অজ্ঞতায় পূর্ণ কোনো গ্রন্থেও অশ্বমেধের এই প্রকার লাভের কথা বলা হয় নি যেমনটা বিংশ শতাব্দীতে এসে এইসব মূর্খ অবাস্তববাদীরা বলে চলেছে। তাদের এসব ব্যাখ্যা আসলে হিন্দু ধর্মের মূল বেদের উপরই কুঠারাঘাত।

আসলে যে কারণে যজ্ঞে এইসব কর্ম মানুষেরা করতোঃ

আদিম কালের মানুষদের কার্য-কারণ সম্বন্ধে খুব কম ধারণাই ছিল। তাই 'এই' 'ওই' কার্যের কারণ 'এটা' 'ওটা' ধরে নেওয়া হত। এইজন্য পাপনাশের জন্য প্রাণীদের হত্যা করা হত। এর পেছনে অজ্ঞানতামূলক স্থূল সাদৃশ্য কাজ করতো। যেমনভাবে গ্রামের প্রধানকে প্রসন্ন করার জন্য উপহার দেওয়া হয়, তেমনি হয়তো দেবতাদের উপহার দিলে দেবতারা প্রসন্ন হয়ে যাবেন এবং মনোকামনা পূর্ণ করবেন। প্রাচীনকালে প্রায়শ খাদ্যকেই উপহার হিসাবে দেওয়া হত। অন্ন এবং পশু উভয়ই খাদ্য ছিল। যেমন গ্রামপ্রধানকে অন্ন এবং পশু আগুনে ঝলসিয়ে উপহার দেওয়া হত, তেমনি দেবতাদের প্রসন্ন করার জন্য অন্ন এবং পশু অগ্নিতে ফেলা হত। এই ধরণের শিশুসুলভ বিশ্বাসই পশুযজ্ঞের সারকথা। এমনই এক শিশুসুলভ বিশ্বাসের অধীন হয়ে পটরানী ঘোড়ার সাথে সঙ্গম করতেন। মনে করা হত এর ফলে তার ঘোড়ার সমান শক্তিশালী পুত্র হবে। দেখুন শতপথব্রাহ্মণে (১৩/১/৯/৯) বলা হয়েছে, অশ্বমেধ যজ্ঞ করার ফলে বাহাদুর পুত্রের জন্ম হয়।

যখন মৈথুনের এই প্রক্রিয়া সর্বসমক্ষে চলত তখন পুরোহিতেরা প্রবাহিত গঙ্গায় হাত ধোয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত অন্যান্য নারীদের সাথে মোখিক কামতৃপ্তিতে লিপ্ত হত। স্বার্থপর লোকেরা পরবর্তীকালেও এইসব অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়াতেই নিজেদের সুবিধা দেখতে পেয়েছিল। এইজন্য নানারকমের পূণ্য, 'পরলোক' এর প্রলোভন প্রভৃতির ঘোষণা করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষের পূর্বপুরুষের প্রতি সম্মান এবং ভালোবাসাকে কাজে লাগিয়ে তাদের নামে যজ্ঞের মাহাত্ম্য সূচক বাক্য নিজেদের পুঁথিতে ঢোকানো হয়েছিল অথবা নিজেদের পুঁথিগুলোকে ওই পূর্বপুরুষদের রচনা বলে প্রচার করা হয়েছিল।

এসব গ্রন্থে যজ্ঞকারী পুরোহিতের জন্য প্রত্যেক যজ্ঞের ভিন্নভিন্ন রকমের বেতনের (দক্ষিণার) কথাও লেখা হয়েছিল। আসলে ওই অর্থ পাওয়ার জন্যই আজ পর্যন্ত পুরোহিতরা যজ্ঞকে জীবিত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়।

আজকে যখন বিজ্ঞান এতটা উন্নতি করেছে এবং আমরা বন্য অবস্থা থেকে অনেক অগ্রসর হয়ে আধুনিক সভ্যতায় বসবাস করছি, তখন কি শিশুসুলভ বিশ্বাসের কারণে, কল্পিত দেবতাদের নামে এমন বীভৎস পশুযজ্ঞ করা এবং খাদ্য পদার্থের নিরর্থক স্বাহা করা উচিত হচ্ছে, বিশেষতঃ তখন যখন এসব যজ্ঞের শাস্ত্রোক্ত ক্রুরতা এবং অশ্লীলতাপূর্ণ ক্রিয়াকলাপে এমনিতেও সভ্যসমাজের লজ্জা হয় এবং নিজেদের সম্মান বাচানোর জন্য নানাধরণের নীচ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়?

হিন্দু ধর্ম এবং টেস্টটিউব বেবী

ভারতে এমন অনেক লোক আছেন, আধুনিক বিজ্ঞান কিছু আবিষ্কার করার পর তারা দাবী করতে থাকেন যে, "আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো আগেই এসব আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন।" এর সমর্থনে তারা বেদ পুরাণের নানা উদাহরণ দিয়ে থাকেন।

যখন থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা টেস্টটিউবের মাধ্যমে বাচ্চার জন্ম দিচ্ছেন, তখন থেকে তারা প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা হাজার হাজার বছর আগেই এসব আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। এজন্য তারা বেদ পুরাণ প্রভৃতির বিভিন্ন কাল্পনিক এবং অসম্ভব গালগল্পকে বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করে পরিবেশন করে থাকেন এবং এই ধরণের লেখাগুলো বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বেশ উৎসাহের সাথেই প্রকাশ করে থাকে। ঐ গালগল্পগুলোর বিবরণ দেওয়ার আগে এবং বিচার করার আগে আমাদের স্পষ্টভাবে জানা উচিত টেস্টটিউব বেবী কি এবং টেস্টটিউব বেবী জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়া ঠিক কি?

এই প্রক্রিয়াটিকে ইংরেজিতে *in vitro fertilization and embryo transfer* বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ হল– টেস্টটিউবে নিষেক এবং গর্ভের স্থানান্তর। এই প্রক্রিয়ায় ঠিক কি করা হয়? নারীর ডিম্বাশয়ে হরমোনের দ্বারা ডিম্বকে পরিপক্ক করা হয়। এরপর একে ওখান থেকে বের করা হয়। ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বকে বের করার জন্য এখন আলট্রা সাউন্ড তরঙ্গের ব্যবহার করা হচ্ছে। মহিলাদের গর্ভে যখন তরঙ্গ ছাড়া হয়, তখন ডিম্বাশয়ের ডিম্ব আলট্রা সাউণ্ড নিঃসরণকারী যন্ত্রের পর্দায় উঠে আসে। এই ডিম্বকে এস্পাইরেটর দ্বারা বের করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অজ্ঞান করার প্রয়োজন হয় না এবং এতে অধিক সময়ও লাগে না। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াতে মহিলাটিকে একবারমাত্র ইঞ্জেকশন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। বের করা ডিম্বকে সূক্ষ্মদর্শী যন্ত্র দ্বারা নিরীক্ষণ করার পর তাকে পেট্রি ডিশে রেখে দেওয়া হয়, যাতে জীবাণুমুক্ত পোষক দ্রব্য থাকে। এভাবে পাওয়া ডিম্বকে ছয় ঘন্টা অবধি এবং পুরুষের শুক্রাণুকে ৩০ মিনিট অবধি ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ইনকিউবেটরে রেখে গতিশীল করা হয়। পূর্বোক্ত পেট্রি ডিশে ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুকে মিলিয়ে আবার একই রকম ইনকিউবেটরে রেখে দেওয়া হয়। দুদিন পর এটা ভ্রুণে পরিণত হয়। এই ভ্রুণকে একটি নালি দ্বারা বায়ুচাপের মাধ্যমে মহিলার গর্ভে স্থাপন করা হয় এবং উপযুক্ত সময়ে মহিলাটি শিশুর জন্ম দেন। সংক্ষেপে এই হল টেস্টটিউব বেবী তৈরির প্রক্রিয়া। এখানে আমরা জটিল মেডিকেল টার্মের বদলে সহজ শব্দ ব্যবহার করেছি, যাতে সাধারণ মানুষেরা সহজেই এই প্রক্রিয়াটি বুঝতে পারেন।

এখন আমরা দেখবো ধর্মগ্রন্থের কোন ধরণের গালগল্পকে অতীতবাদী হিন্দুরা টেস্টটিউব

বেবীর উদাহরণ হিসেবে পরিবেশন করে থাকে। এই ধরণের কিছু উদাহরণ বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হচ্ছে।

কলসি থেকে আগস্ত এবং বশিষ্ঠ

ঋগ্বেদে আছে, মিত্র এবং বরুণ নামক দুজন দেবতা উর্বশী নামক অপ্সরাকে দেখে কামার্ত হয়ে পড়েছিলেন। তারা তাদের স্খলিত বীর্যকে যজ্ঞের কলসিতে রেখেছিলেন। সেই কলসি থেকে অগস্ত এবং বশিষ্ঠ ঋষি উৎপন্ন হয়েছিলেনঃ

উতাসি মৈত্রাবরুণো বসিষ্ঠোর্বশ্যা ব্রহ্মন্ মনসোধি জাতঃ,
দ্রপ্সং স্কন্নং ব্রহ্মণা দৈব্যন বিশ্বে দেবাঃ পুস্করে ত্বাদদন্ত।
সত্রে হ জাতাবিষিতা নমোভিঃ কুম্ভে রেতঃ সিষিচতুঃ সমানম্,
ততো হ মান উদিয়ায় মধ্যাত্ততো জাতমৃষিমাহুর্বসিষ্ঠম্।
-ঋগ্বেদ ৭/৩৩/১১, ১৩

অর্থাৎ, হে বশিষ্ঠ, তুমি মিত্র এবং বরুণের পুত্র। হে ব্রহ্মন, তুমি উর্বশীর মন থেকে জাত। সেই সময় মিত্র এবং বরুণের বীর্য স্খলন হয়েছিল। বিশ্ববেদগণ দৈব স্তোত্র দ্বারা পুষ্কর মধ্যে তোমায় ধারণ করেছিলেন। যজ্ঞে দীক্ষিত মিত্র এবং বরুণ স্তুতি দ্বারা প্রার্থিত হয়ে কুম্ভের মাঝে একসাথে বীর্য (রেতঃ) স্খলন করেছিলেন। এরপর মান (অগস্ত্য) উৎপন্ন হলেন। লোকে বলে ঋষি বশিষ্ঠও এই কুম্ভ হতেই জন্মেছিলেন।

কার্তিকের উৎপত্তি

বাল্মিকী রামায়ণের বালকাণ্ডে আছে, অগ্নি দেবতা গঙ্গাকে গর্ভবতী করেছিলেন। যখন গঙ্গা গর্ভ ধারণ করতে অসমর্থ হলেন তখন তিনি তাকে হিমালয়ের পাশের এক জঙ্গলে তা ফেলে দিলেন। সেই ফেলে দেওয়া গর্ভ হতে যে বালক উৎপন্ন হল, তাকে কার্তিকেয়[১] বলা হলঃ

দেবতানাং প্রতিজ্ঞায় গঙ্গামধ্যেত্য পাবকঃ,
গর্ভ ধারয় বৈ দেবী দেবতানামিদং প্রিয়ম্। (৩৭/১২)
সমন্ততস্তদা দেবীমভ্যষিংচত পাবকঃ। ১৪
তমুবাচ ততো গঙ্গা সর্বদেবপুরোগমম্,
অশক্তা ধারণে দেব তেজস্তব সমুদ্ধতম্।১৫
ইহ হৈমবতে পার্শ্বে গর্ভোঅয়ং সংনিবেশ্যতাম্,

---

১ শিব এর দ্বিতীয় পুত্র

গঙ্গা তু গর্ভমতিভাস্বরম্।১৭
উৎসসর্জ মহাতেজাঃ স্রোতেভ্যো হি তদানধ।১৮
নিক্ষিপ্তমাত্রে গর্ভে তু তেজোভিরভিরঞ্জিতম্।২১
তং কুমারং ততো জাতম্... ২৩
-বাল্মিকী রামায়ণ, বালকাণ্ড, অধ্যায় ৩৭

অর্থাৎ, দেবতাদের প্রতিজ্ঞা করে অগ্নি দেব গঙ্গার কাছে এসে বললেন, “হে দেবী, তুমি আমার দ্বারা গর্ভবতী হও, এটাই দেবতাদের ইচ্ছা।” তখন অগ্নি তাকে সেচন করেছিলেন অর্থাৎ গর্ভবতী করেছিলেন। তিনি অগ্নির তেজোময় গর্ভকে ধারণ করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। গঙ্গা অগ্নির কথামত সেই গর্ভকে হিমালয়ের পাশে ফেলে দিয়েছিলেন। তা থেকে এক তেজস্বী কুমার অর্থাৎ কার্তিকেয়ের জন্ম হয়েছিল।

ষাট হাজার পুত্র

বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডে অন্য এক কথা পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে, রাজা সগরের দুই রানী ছিলেন। কেশিনী এবং সুমতি তাদের নাম। কেশিনী এক পুত্রের জন্ম দিলেন কিন্তু সুমতির গর্ভ হতে একটি তুম্ব (লাউ) বের হল। সেটি ফেটে ষাট হাজার পুত্রের জন্ম হল।

সুমতিস্তু নরব্যাঘ্র গর্ভতুংবং ব্যজায়ত,
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি তুম্বভেদাদ্ বিনিঃসৃতাঃ। ১৭
ঘৃতপূর্ণেষু কুম্ভেষু ধাত্র্যস্তান্ সমবর্ধয়ন্,
কালেন মহতা সর্বে যৌবনং প্রতিপেদিরে। ১৮
-বাল্মীকি রামায়ণ, বালকাণ্ড, অধ্যায় ৩৮

অর্থাৎ, সুমতি একটি তুম্বের জন্ম দিলেন। তা বিদীর্ণ করে ষাট হাজার পুত্র বেরোলেন। ধাত্রীরা তাদের ঘৃতপূর্ণ পাত্রে রাখলেন। কিছু সময় পরে এরা বড় হয়ে গেল।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই কাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবরণও পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে-

সুমতিশ্চাপি তৎকালে গর্ভালাবুমসূয়ত,
ভগবানৌর্বস্তত্রাগচ্ছদ্ যদৃচ্ছয়া তমুবাচ ত্বরান্বিতঃ।
গর্ভালাবুরয়ং রাজন্ন ত্যক্তুং ভবতার্হিতি,
পুত্রাণাং ষষ্টিসহস্রংবীজভূতো যতস্তব।
তস্মাত্তৎসকলীকৃত্য ঘৃতকুম্ভেষু যত্নতঃ,

নিঃক্ষিপ্য সপিধানেষু রক্ষণীয়ং পৃথক্পৃথক্,
কালে পূর্ণে ততঃ কুম্ভান্ ভিত্বা নির্য়ান্তি তে পৃথক্,
এবং তে ষষ্টিসাহস্রং পুত্রাণাং জায়তে নৃপ।
রাজা চ তত্তথা চক্রে ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে ঘৃতকুম্ভাত্,
ক্রমেণ তে ভিত্ত্বাভিত্ত্বা পুনর্জজ্ঞুঃ সহসৈবানুসারম্।
-ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, উপোদ্ঘাতপাদ, ৫১/৩৯-৪৬

অর্থাৎ, সুমতি যখন গর্ভ হতে একটি তুম্বের জন্ম দিলেন তখনই সেখানে ঔর্ব ঋষি হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাজাকে বললেন, এই তুম্বকে ফেলে দিও না। এর মধ্যে তোমার ষাট হাজার পুত্রের বীজ নিহিত আছে। একে কেটে ষাট হাজার টুকরো করো এবং প্রত্যেক টুকরোকে একটি করে ঘৃতপাত্রে রেখে ঢাকনা দাও। সময় হলে তারা ওই পাত্রগুলোকে ভেঙ্গে নিজে নিজেই বেরিয়া আসবে। রাজা এমনটিই করলেন। এক বছর পরে, প্রত্যেকটি পাত্রকে ভেঙ্গে তারা বেরোতে শুরু করলো।

নাক থেকে শিশুর জন্ম

বিষ্ণু পুরাণে আছে, মনু হাঁচি দিলে তার নাক থেকে একটি শুশুর জন্ম হয়েছিলঃ

ক্ষুতবতশ্চ মনোরিক্ষ্বাকুঃ পুত্রো জজ্ঞে ঘ্রাণতঃ। -বিষ্ণু পুরাণ ৪/২/১১

অর্থাৎ, হাঁচি দেওয়ার সময় মনুর নাক থেকে ইক্ষ্বাকু নামক এক পুত্রের জন্ম হল।

কোলে পড়া বীর্য থেকে বাচ্চা

শিবপুরাণে আছে, শিব ও পার্বতীর বিবাহকালে যখন পার্বতী মাত্র চারবার প্রদক্ষিণ করেছেন তখন ব্রহ্মা পার্বতীর আঙ্গুল দেখতে পেলেন। তা দেখেই ব্রহ্মা কামোত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং তার বীর্য স্খলিত হয়। সেই বীর্য ব্রহ্মার কোলে পড়েছিল। তিনি সেটাকে লুকোতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা থেকে অসংখ্য ব্রহ্মচারীর জন্ম হয়েছিলঃ

প্রদক্ষিণং তথা চাগ্নেশ্চতুর্ধা চ কৃতং তদা,
ব্রহ্মণঃ স্খলনং জাতং শিবাংগুষ্ঠদর্শনাত্।
তদ্ গোপিতং তেন হ্যুৎসংগে পতিতং চ যত্,
ততো জাতস্ত্বসংখ্যাতা বটুকা ব্রহ্মসূত্রকাঃ।
– শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা ১৮

পতিত বীর্য হতে হাজার বছর পরে শিশুর জন্ম

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে যে, কৃষ্ণের বীর্যস্খলন হলে, তিনি লজ্জাবশত তা জলে মিশিয়ে দেন। এক হাজার বছর পরে সেই বীর্য হতে একটি শিশুর জন্ম হয়েছিলঃ

কৃষ্ণস্য কামবাণেন রেতঃ পানো বভূব হ,
জলে তদ্রেচনং চক্রে লজ্জয়া সুরসংসদি।
সহস্রবৎসরান্তে তড় ডিম্বরূপং বভূব হ,
ততো মহান্ বিরাড় জজ্ঞে।
-ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ৪/২৩-২৪

অর্থাৎ, কামবশীভূত হওয়ার ফলে কৃষ্ণের বীর্যস্খলন হল। দেবসভায় অবস্থানকালে লজ্জাবশত একে লুকোতে গিয়ে তিনি তা জলে ফেলে দিলেন। এক হাজার বছর পরে সেটি ডিম্বে পরিণত হয়েছিল এবং তা থেকে মহান বিরাটের জন্ম হয়েছিল।

কাঠ হতে পুত্রের জন্ম

দেবীভাগবত পুরাণে আছে, একবার বেদব্যাস যজ্ঞের উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালানোর জন্য অরণিমন্থন করছিলেন। তখন তিনি ঘৃতাচী নামে এক অপ্সরাকে দেখতে পান এবং কামুক হয়ে পড়েন। তার বীর্য পতিত হয়। তা কাঠের উপর গিয়ে পড়ে। সেখান থেকে ব্যাসদেবের সমান আকৃতিযুক্ত এক পুত্র উৎপন্ন হল। তার নাম হয় শুকদেবঃ

কামস্তু দেহে ব্যাসস্য দর্শনাদেব সংগতঃ,
বহুশো গৃহ্যমাণং চ ঘৃতাব্যা মোহিতং মনঃ।
মন্থনং কুর্বতস্তস্য মুনেরাগ্নিচিকীর্ষয়া,
অরণ্যামেব সহসা তস্য শুক্রমথাপতত্।
সোবিচিন্ত্য তথা পাতং মমন্থারণিমেব চ,
তস্মাচ্ছুকঃ সমুদ্ভূতো ব্যাস্যাকৃতিমনোহরঃ।
-দেবীভাগবতপুরাণ ১/১৪

অর্থাৎ, তাকে (ঘৃতাচী অপ্সরাকে) দেখার সাথে সাথেই ব্যাস কামবশীভূত হয়ে পড়লেন। ঘৃতাচী তার হৃদয় হরণ করেছিলেন। আগুন জ্বালানোর জন্য অরণীমন্থন করছিলেন ব্যাসদেব। তার বীর্য অরণিতে পতিত হল। এর পরোয়া না করে তিনি অরণীমন্থন করতে লাগলেন। তা থেকে ব্যাসের সমান আকৃতি সম্পন্ন শুক নামে এক বালকের জন্ম হল।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের স্ত্রী মমতাকে বৃহস্পতি ধর্ষণ করেছিলেন। তার বীর্য হতে ভরদ্বাজ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়েছিলঃ

অন্তর্বত্ন্যাং ভ্রাতৃপত্ন্যাং মৈথুনায় বৃহস্পতিঃ,
প্রবৃত্তে বারিতো গর্ভং শপ্ত্বা বীর্যমবাসৃজত।
তং ত্যক্তুকামাং মমতাং ভর্তৃত্যাগবিশংকিতাম্,
নামনির্বচনং তস্য শ্লোকমেকং সুরা জগুঃ।
মূঢে ভর দ্বাজমিমং ভর দ্বাজং বৃহস্পতেঃ,
যাতৌ তদুক্ত্বা পিতরৌ ভরদ্বাজস্ততস্ত্বয়ম্।
চোদ্যমানা সুরৈরেবং মত্বা বিতথমাত্মজম্,
ব্যসৃজত্ ...
–শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ ৯/২০/৩৬-৩৯

অর্থাৎ, বৃহস্পতি গর্ভবতী ভ্রাতৃবধূর সাথে সম্ভোগে প্রবৃত্ত হলেন। গর্ভস্থ শিশু তাকে থামালে তিনি গর্ভকে অভিশাপ দিয়ে সম্ভোগ করতে লাগলেন এবং তার বীর্য স্খলিত হল। সেই বীর্যকে ভ্রাতৃবধূ ফেলে দিতে চাইছিলেন, যাতে তার স্বামী তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ত্যাগ না করেন। তখন দেবতারা বললেন- হে মূর্খ নারী, এই বীর্য ধারণ করে থাকো। তিনি তাকে ধারণ করলেন এবং যে পুত্রের তিনি জন্ম দিলেন তার নাম হল ভরদ্বাজ।

কলসি হতে দ্রোণাচার্যের জন্ম

এই ভরদ্বাজই একবার গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিলেন। সেখানে অপ্সরা ঘৃতাচী স্নান করে কাপড় বদল করছিলেন। ভরদ্বাজ তাকে দেখলেন। ঘৃতাচীর শরীরের এক অংশ হতে কাপড় সরে গিয়েছিল, তা দেখে ভরদ্বাজের বীর্য স্খলিত হল। এই বীর্য তিনি এক দ্রোণে (কলসিতে) রাখলেন। সেই দ্রোণ থেকে এক বালক উৎপন্ন হল। দ্রোণ থেকে জন্ম হওয়ায় তার নাম হল ‘ দ্রোণ’ ঃ

গঙ্গাদ্বারং প্রতি মহান্ বভূব ভগবানৃষিঃ।
ভরদ্বাজ ইতি খ্যাতঃ ...
দদর্শাপ্সরসং সাক্ষাদ্ ঘৃতাচীমাপ্লুতামৃষিঃ,
রূপযৌবনসম্পন্নাং মদদৃপ্তাং মদালসাম্।
তস্যাঃ পুনর্নদীতীরে বসনং পর্যবর্তত,
ব্যপকৃষ্টাংবরাং দৃষ্ট্বা তামৃষিশ্চকমে ততঃ।

তত্র সংসক্তমনসো ভরদ্বাজস্য ধীমতঃ,
ততোহস্য রেতশ্চস্কন্দ তদৃষির্দ্রোণ আদধে।
ততঃ সমভবদ্ দ্রোণঃ কলশে তস্য ধীমতঃ।
-মহাভারত, আদিপর্ব, ১২৯/৩৩-৩৮

তীর হতে কৃপাচার্যের জন্ম

মহাভারতে আছে, শরদ্বান ঋষি জানপদী নামক অপ্সরাকে যখন বনে একবসনা দেখতে পেয়েছিলেন, তখন তার বীর্য পতিত হয়েছিল। সেই বীর্য তীরের উপর পতিত হয়েছিল। তা থেকে কৃপ নামে এক বালকের জন্ম হয়েছিল, যে পরবর্তীকালে পাণ্ডবদের ধনুর্বেদ এর আচার্য হয়েছিলঃ

ততো জানপদীং নাম দেবকন্যাং সুরেশ্বরঃ প্রাহিণোত্। ৬
... তামেকবসনাং দৃষ্ট্বা গৌতমোহপ্সরসং বনে,
... প্রোৎফুল্লনয়নোঅভবত্। ৮
ধনুশ্চ হি শারাস্তস্য করাভ্যামপতন্ ভুবি,
বেপথুশ্চাপি তাং দৃষ্ট্বা শরীরে সমজায়ত। ৯
তেন সুস্রাব রেতোহস্য... ১১
... রেতস্তত্ তস্য শারস্তম্বে পপাত চ। ১৩
তস্যাথ মিথুনং জজ্ঞে গৌতমস্য শরদ্বনঃ,
মৃগয়া চরতো রাজ্ঞঃ শংতনোস্তু... ১৪
স রাজ্ঞে দর্শয়ামাস মিথুনং সশরং ধনুঃ । ১৬
কৃপয়া যন্ময়া বালাবিমো সংবর্ধিতাবিতি। ১৯
তস্মাত্ তয়োর্নাম চক্রে তদেব স মহীপতিঃ। ২০
-আদি পর্ব, অধ্যায় ১২৯

অর্থাৎ, তখন ইন্দ্র জানপদী নামক এক অপ্সরাকে পাঠালেন। তাকে বনে একবসনা দেখে শরদ্বান এর চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। তার হাত হতে ধনুর্বাণ পতিত হল। শরীর কাঁপতে শুরু করলো। তার বীর্য স্খলিত হল। সেই বীর্য ধনুর্বাণের উপর পতিত হয়েছিল। তা থেকে দুই শিশুর (একটি ছেলে ও একটি মেয়ের) জন্ম হয়েছিল। শিকারের জন্য আসা রাজা শান্তনুকে এক লোক সেই শিশুদের দেখালেন। শান্তনু তাদের নিজের ঘরে নিয়ে এলেন। তিনি যেহেতু তাদের উপর কৃপা করে তাদের পালন করলেন, তাই তাদের নামও সেভাবেই রাখলেন, কৃপ ও কৃপী।

পুরুষের গর্ভ হতে পুত্রের জন্ম

শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে আছে, রাজা যুবনাশ্ব একবার ইন্দ্রযজ্ঞ করেছিলেন। তিনি রাতে পিপাসার্ত হয়ে যজ্ঞশালায় পৌঁছেছিলেন। সেখানে পুরোহিতদের ঘুমিয়ে থাকতে দেখে তিনি এক পাত্র থেকে জল পান করলেন। সেই জলকে পুত্র উৎপন্ন করার মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করা হয়েছিল। সুতরাং, কিছু সময় পরে রাজার গর্ভের ডান অংশ ভেদ করে এক বালক উৎপন্ন হলেন। এই বালকই হলেন পরবর্তীকালের চক্রবর্তী রাজা মান্ধাতাঃ

ইষ্টিং স্ম বর্তয়াংচক্রুরৈন্দ্রীং সুসমাহিতাঃ। ২৬
রাজা তদ্ যজ্ঞসদনং প্রবিষ্টো নিশি তর্ষিতঃ,
দৃষ্ট্বা শয়ানান্ বিপ্রাংস্তান্ পপৌ মন্ত্রজলং স্বয়ম্। ২৭
ততঃ কাল উপাবৃত্তে কুক্ষিং নির্ভিদ্য দক্ষিণম্,
যুবনাশ্বস্য তনয়শ্চক্রবর্তী জজান হ।৩০
মান্ধাতা... ৩১
-শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ , নবম স্কন্ধ, অধ্যায় ৬

জঙ্ঘা এবং বাহু হতে শিশুর জন্ম

এই পুরাণের অন্যত্র আছে, রাজা বেন এর মৃত্যুর পর ঋষিরা তার জঙ্ঘার মন্থন করেছিলেন এবং তা থেকে নিষাদ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়েছিলঃ

ঋষয়ো বিপন্নস্য মহীপতেঃ,
মমন্থুরুরুং তরসা তত্রাসীদ্ বাহুকো নরঃ। ৪৩
কাককৃষ্ণোহতিহ্রস্বাংগো হ্রস্ববাহুর্মহাহনুঃ,
হ্রস্বপান্নিম্ননাসাগ্রো রক্তাক্ষস্তাম্রমূর্ধজঃ। ৪৪
স নিষাদস্ততোহভবত্। ৪৫
-শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ , স্কন্ধ ৪, অধ্যায় ১৪

অর্থাৎ, ঋষিরা মৃত রাজা বেন এর জঙ্ঘার অনেক দ্রুত মন্থন করলেন। সেখান থেকে এক পুরুষ বের হলেন। তার গায়ের রঙ ছিল কাকের মত কালো। তার অঙ্গ, বাহু, পা ছিল ছোটো, চোয়াল ছিল বিশাল, নাক ছিল অনুন্নত, চোখ ছিল লাল এবং চুল ছিল তামাটে। সে নিষাদ নামে পরিচিত হল।

আবার সেই মৃত রাজার বাহুকে ঘষা হল। তা থেকে পুনরায় এক ছেলে এবং এক মেয়ের জন্ম হলঃ

অথ তস্য পুনর্বিপ্রৈরপুত্রস্য মহীপতেঃ
বাহুভ্যাং মথ্যমানাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত। ১
তদ্ দৃষ্টাঞ্চ মিথুনং জাতমৃষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ,
ঊচুঃ । ২
অয়ং তু ... পৃথুর্নাম মহারাজো ভবিষ্যতি পৃথুশ্রবাঃ । ৪
ইয়ং চ সুদতী দেবী ... অর্চির্নাম বরারোহা ... ৫
-শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ, স্কন্দ ৪, অধ্যায় ১৫

অর্থাৎ, আবার সেই পুত্রহীন রাজার শবের বাহুকে বিপ্ররা মন্থন করলেন। তা থেকে এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হল। তাদের দেখে ব্রহ্মবেত্তা ঋষিরা বললেন, এই ছেলে পৃথু নামে বিখ্যাত হবে এবং মহারাজা হবে এবং এই মেয়ের নাম হবে অর্চি।

গাভী থেকে মানব শিশুর জন্ম

পদ্মপুরাণে আছে, একবার আত্মদেব নামে এক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণকে এক মহাত্মা এমন ফল দিয়েছিলেন যা খেলে গর্ভবতী হওয়া যেত। ব্রাহ্মণটি সেই ফলটি একটি গরুকে খাইয়ে দিয়েছিলেন।

ত্রিমাসে নির্গতে চাথ সা ধেনুঃ সুষুবেঅর্থকম্,
সর্বাঙ্গসুন্দরং দিব্যং নির্মলং কনকপ্রথম্।
ভাগ্যোদয়োহধুনা জাত আত্মদেবস্য পশ্যত,
ধেন্বা বালঃ প্রসূতস্ত্ত দেবরূপিতী কৌতুকম্।
গোকর্ণং তং সুতং দৃষ্টা গোকর্ণং নাম চাকরোত্।
-পদ্মপুরাণ, উত্তরখন্ড ৪/৬২-৬৫

অর্থাৎ, তিন মাস পরে গাভীটি একটি সুন্দর, দিব্য এবং স্বর্ণোজ্জ্বল বালকের জন্ম দিল। লোকেরা কৌতুকবশত বলতে লাগলো, দেখো- আজ আত্মদেবের ভাগ্য খুলেছে। সেই শিশুর কান গরুর কানের সমান ছিল, তাই আত্মদেব বালকের নাম রাখলেন, 'গোকর্ণ'।

মাংসপিণ্ড হতে ১০১ শিশুর জন্ম

মহাভারতের আদিপর্বে আছে, ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী তখনও দুই বছর অবধি গর্ভবতী,

কিন্তু কুন্তী ইতিমধ্যেই এক সুন্দর পুত্রের জন্ম দিয়েছেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে গান্ধারী একদিন তার গর্ভতে ভীষণ আঘাত করেছিলেন, যার ফলে তার গর্ভপাত হয়েছিল। বের হওয়া মাংসপিণ্ডকে গান্ধারী যখন ফেলে দিতে চেয়েছিলেন, তখন ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, "এর একশো টুকরো করে তাদের ঘৃতপূর্ণ কলসিতে শীঘ্রই রেখে দাও।" গান্ধারী মাংসপিণ্ডটিকে আঙ্গুলের পর্বের সমান একশ এক খণ্ড করে তাদের ঘৃতপূর্ণ কলসে রাখলেন। তিন মাস পর সেই কলসগুলো থেকে একশ পুত্র এবং একটি কন্যার জন্ম হয়েছিলঃ

সংবৎসরদ্বয়ং তু গান্ধারী গর্ভমাহিতম্। ৯
শ্রুত্বা কুন্তীসুতং জাতং ... ১০
সোদরং ঘাতয়ামাস গান্ধারী দুঃখমূর্চ্ছিতা।
ততো যজ্ঞে মাংসপেশী লোহাষ্ঠীলেব সংহতা। ১২
... তামুৎস্রষ্টুং প্রচক্রমে,
অথ দ্বৈপায়নো জাত্বা ত্বরিতঃ সমুপাগমত্। ১৩
ঘৃতপূর্ণং কুন্ডশতং ক্ষিপ্রমেব বিধীয়তাম্। ১৮
সুগুপ্তেষু চ দেশেষু রক্ষা চৈব বিধীয়তাম্। ১৯
অঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্রাণাং গর্ভণাং পৃথগেব তু। ২০
একাধিকশতং পূর্ণং যথাযোগং বিশাংপতে। ২১
ততস্তাংস্তেষু কুণ্ডেষু গর্ভানবদধে তদা। ২২
ততঃ পুত্রশতং পূর্ণং ধৃতরাষ্ট্রস্য পার্থিব। ৪০
মাসত্রয়েণ সংজজ্ঞে কন্যা চৈকা শতাধিকা। ৪১
-মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১১৪

আগুন থেকে দুই শিশুর জন্ম

মহাভারত অনুসারে, রাজা দ্রুপদ এর পুত্রেষ্টি যজ্ঞে রানীকে খাওয়ানোর জন্য এক বিশেষ প্রকারের পদার্থ তৈরি করা হয়েছিল। রানীকে যজ্ঞশালায় উপস্থিত হয়ে সেটা খেতে হত, কিন্তু ঋতুমতী হবার কারণে তিনি যজ্ঞশালায় উপস্থিত হয়ে তা খেতে পারেন নি। তাই, যাজ নামক এক পুরোহিত সেই পদার্থটিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছিলেনঃ

এবমুক্ত্বা তু যাজেন হুতে হবিষি সংস্কৃতে,
উত্তস্থৌ পাবকাত্ তস্মাত্ কুমারো দেবসংনিভঃ।
কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদীমধ্যাত্ সমুত্থিতা,
সুভগা দর্শনীযাংগী...
–মহাভারত, আদিপর্ব, ১৬৬/৩৯, ৪৪

অর্থাৎ, যাজ একথা বলে সেই পদার্থটিকে, হবন সামগ্রীকে জ্বলন্ত হবন কুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন। তা থেকে দেবসম এক বালক বের হল এবং সুন্দরাঙ্গী দ্রৌপদী নামে এক বালিকা বের হল।

সেই বালকটির নাম হল ধৃষ্টদ্যুম্ন, যে মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবদের সেনাপতি ছিল।

মাছের পেট হতে মানবসন্তান

মহাভারতে উপরিচর নামে এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রাজা একবার জঙ্গলে বীর্যপাত করেছিলেন। রাজা সেই বীর্যকে উঠিয়ে এক পত্রে রাখলেন এবং তা তার স্ত্রীর ধারণের জন্য বাজ পাখির মাধ্যমে তিনি সেই বীর্য পাঠালেন। সেই পাখিটি যখন বীর্য নিয়ে যাচ্ছিল, তখন আরেক বাজ তাকে হামলা করেছিল। এর ফলে সেই বীর্য নদীতে পড়ে গিয়েছিল এবং মাছে পরিণত হওয়া এক অপ্সরা একে খেয়ে ফেলেছিল। দশ মাস পরে সেই মাছটি এক জেলের জালে ধরা পড়েছিল। সেই মৎস্যজীবী মাছটির পেটে এক বালক ও এক বালিকাকে পেয়েছিল। রাজা উপরিচর বালকটির নাম মৎস্য রেখেছিলেন এবং তাকে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু বালিকাটিকে মৎস্যজীবিকে সঁপে দিয়েছিলেন। পরে এই বালকাটি সত্যবতী নামে বিখ্যাত হয়েছিল এবং পরাশরের পুত্র ব্যাসদেবের মা হয়েছিল।

রাজোপরিচরেত্যেবং নাম তস্যাথ বিশ্রুতম্। ৩৪
তস্য রেতঃ প্রচস্কন্দ চরতো গহনে বনে। ৪৯
স্কন্নমাত্রং চ তদ্ রেতো বৃক্ষপত্রেণ ভূমিপঃ
প্রতিজগ্রাহ ...৫০
শ্যেনং ততোঽব্রবীত্।
মৎপ্রিয়ার্থমিদং সৌম্য শুক্রং মম গৃহং নয়। ৫৪
অভ্যদ্রবচ্চ তং সদ্যো দৃষ্টেব্বামিষশংকয়া। ৫৭
শ্যেনপাদপরিভ্রষ্টং তদ্ বীর্যমথ বাসবম্। ৫৯
জগ্রাহ তরসোপেত্য সাদ্রিকা মৎস্যরূপিণী,
কদাচিদপি মৎসীং তাং ববন্ধুর্মৎস্যজীবিতঃ। ৬০
মাসে চ দশমে প্রাপ্তে তদা ভরতসত্তম,
উজ্জাহ্রুরুদরাত্ তস্যাঃ স্ত্রীং পুমাংসং চ মানুষম্।৬১
তয়োঃ পুমাংসং জগ্রাহ রাজা পরিচরস্তদা,
স মৎস্যো নাম রাজাসীদ্ ধার্মিকঃ সত্যসংগরঃ। ৬৩
সা কন্যা দুহিতা তস্যা মৎস্যা ... রাজা দত্তা দাশায়। ৬৭

দ্বৈপায়নী জজ্ঞে। সত্যবত্যাং পরাশরাত্। ৮৬
-মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ৬৩

ক্ষীর খেয়ে গর্ভবতী

রাম এবং তার ভাইদের জন্ম প্রসঙ্গে বাল্মীকিরামায়ণে লেখা আছে, যখন রাজা দশরথের আয়ু ষাট হাজার বছর হয়েছিল, তখন তিনি এক যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেনঃ

ততো বৈ যজমানস্য পাবকাদতুলপ্রভবম্,
প্রাদুর্ভূতং মহদ্ ভূতং মহাবীর্যং মহাবলম্। ১১
দিব্যপায়সসংপূর্ণাং পাত্রীং পত্নীমিব প্রিয়াম্,
প্রগৃহ্য বিপুলাং দোর্ভ্যাং স্বয়ং মায়াময়ীমিব। ১৫
সমবেক্ষ্যাব্রবীদ্ বাক্যমিদং দশরথং নৃপম্। ১৬
ভার্যাণামনুরূপাণামশ্নীতেতি প্রযচ্ছে বৈ,
তাসু ত্বং লপ্স্যসে পুত্রান্ যদর্থং যজসে নৃপ। ২০
ততস্ত তাঃ প্রাশ্য তমুত্তমস্ত্রিয়ো মহীপতেরূত্তমপায়সং পৃথক্,
হুতাশনাদিত্যসমানতেজসোহচিরেণ গর্ভান প্রতিপেদিরে তদা। ৩০
-বালকাণ্ড, অধ্যায় ১৬

অর্থাৎ, সেই যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড থেকে এক পুরুষ বের হলেন। তার হাতে ক্ষীরপূর্ণ এক পাত্র ছিল। তিনি সেই পাত্র দশরথকে দিয়ে বললেন, “রাজন, এই ক্ষীর তুমি নিজ পত্নীদের খাওয়ার জন্য নাও। এর ফলে তোমার পুত্রপ্রাপ্তি হবে।” রানীরা ক্ষীর খেয়ে গর্ভবতী হলেন। যথাসময়ে তারা চার পুত্রের জন্ম দিলেন।

ক্ষেতে জন্মানো মানবশিশু

সীতার বিষয়ে রামায়ণে বলা হয়েছে, যখন রাজা জনক ক্ষেতে লাঙ্গল চালাচ্ছিলেন তখন তিনি সীতাকে সেই ক্ষেতে পেয়েছিলেন। জনক যেহেতু তাকে ক্ষেত থেকে পেয়েছিলেন, তাই তাকে অযোনিজ বলা হলঃ

অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাংগলাদুত্থিতা ততঃ,
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা সীতেতি বিশ্রুতা। ১৩
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্ধত মমাত্মজা। ১৪
বীর্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেযমযোনিজা। ১৫
-বালকাণ্ড, ৬৬ অধ্যায়

অর্থাৎ, জনকের কথন অনুসারে, "যখন আমি লাঙ্গল চালাচ্ছিলাম, তখন ও লাঙ্গলের ফলার দ্বারা উপরে উঠেছিল। ওর নাম সীতা। ও পৃথিবী হতে জন্ম নেওয়া আমার কন্যা। ও কোনো নারীর গর্ভ হতে উৎপন্ন হয়নি"

এই ধরণের কাহিনীগুলো প্রধানত দুই কারণে বিজ্ঞানের মোড়কে প্রচার করা হয়ে থাকে যথা- ১) অজ্ঞানতা ও ২) অসঙ্গত প্রলাপ বকার স্বভাব।

'অজ্ঞানতা'বশত প্রচার

ক) অজ্ঞানতার ফলে অনেকে বলে থাকে যে, টেস্টটিউবে বাচ্চা জন্মানোর কথা আদিম ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবে এমনটি দেখা যায় না। আমরা পূর্বেই এই কাহিনীগুলোর পর্যালোচনায় তা দেখেছি। যেসব জায়গায় কলসি থেকে শিশু জন্মানোর ঘটনাকে টেস্টটিউব বেবির উল্লেখ বলে কিছুলোক প্রচার করছেন, তারা অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে এই দাবী করছেন।

খ) কিছু লোক পেট এবং গর্ভাশয় এর পার্থক্য না বুঝে এসব কাহিনী প্রচার করে থাকে। শিশুর বিকাশ গর্ভাশয়ে হয়, পেটে হয় না। এ প্রকার অজ্ঞানতার ফলে মুখ দিয়ে খেয়ে ফেলা বীর্য থেকে পেটে শিশু বিকশিত হয় এবং এই ধরণের কাহিনীগুলোকে টেস্টটিউব বেবী বলে প্রচার করা হয়। যারা এসব প্রচার করে থাকে, তারা মূলত অজ্ঞানতার শিকার।

গ) কিছু কাহিনী বীর্যের শুক্রাণুর প্রকৃতি না জানার ফলে প্রচার করা হয়ে থাকে। এইসব কাহিনীতে বীর্যকে এমন পদার্থ হিসেবে দেখানো হয়, যার উপর অন্য জীবাণুর, তাপমাত্রার তারতম্য প্রভৃতির কোনো প্রভাব নেই এবং এর কার্যক্ষমতা যেন সবসময় একই রকম থাকে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হল, একটি নির্ধারিত তাপমাত্রার কম বা বেশি হলে বীর্যের শুক্রাণু নষ্ট হয়ে যায় এবং এদের উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

ঘ) কিছু কাহিনী ভ্রুণের প্রকৃতি না জানার ফলে প্রচার করা হয়ে থাকে। ভ্রুণকে তরল নাইট্রোজেনে রেখে[১] সুরক্ষিত রাখা যেতে পারে। দুবছর অবধি ভ্রুণ এতে থাকতে পারে কিন্তু যেসব কাহিনীতে ভ্রুণকে একশো বা ষাট হাজার টুকরো করে ঘৃতকুম্ভে রাখার কথা বলা হয়েছে এবং কলসি থেকে তিন মাসের মধ্যে শিশু জন্ম হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেসব কাহিনীকে প্রচার করা লোকজনের ভ্রুণ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব রয়েছে। তাই তারা এই ধরণের কাহিনী প্রচার করছে।

---

১ নাইট্রোজেন ২৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তরল রূপ ধারণ করে

শেষের কাহিনীগুলো, যেগুলোতে আগুন থেকে শিশুর জন্ম হতে দেখা যায়, গরু বা ঘোড়া মানব শিশুর জন্ম দেয়, নাক, জঙ্ঘা এবং বাহু হতে শিশুর জন্ম হয়, তাদের টেস্টটিউব বেবীর প্রমাণ হিসেবে যারা প্রচার করে থাকে, তারা কেবল তাদের অজ্ঞানতার ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জানান দেন না বরং এটাও বুঝিয়ে দেন যে তাদের কথাবার্তা পাগলের প্রলাপ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সংক্ষেপে এটা বলা যেতে পারে, ধর্মগ্রন্থের এসব এবং এর মতো কাহিনীগুলোর বিজ্ঞানের চাইতে অজ্ঞানের সাথে বেশি সম্পর্ক আছে। গোঁজামিলবাজের মত এভাবে গোঁজামিল দিয়ে না হিন্দু ধর্মগ্রন্থের মহিমা তো বাড়ানো যায়, না হিন্দু সমাজের কোনো কল্যাণ করা সম্ভব। তবে এভাবে অবৈজ্ঞানিক মানসিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথে অবশ্যই বাঁধা সৃষ্টি করা যায়।

এমতাবস্থায় প্রয়োজন হল, বৈজ্ঞানিক মানসিকতাকে ধারণ করার এবং এই ধরণের নিচ এবং পলায়নবাদী মানসিকতাকে ত্যাগ করার। এর মধ্যেই হিন্দু সমাজ এবং ভারতবর্ষের কল্যাণ নিহিত আছে।

* সমাপ্ত *

‘क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिन्दु धर्म?’ নামক মূল পুস্তকটি লিখেছেন ড. সুরেন্দ্র কুমার শর্মা ‘অজ্ঞাত’। লেখকের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা একটি প্রথাবদ্ধ হিন্দু পরিবারে। তার পিতা ছিলেন পণ্ডিত অমরনাথ শাস্ত্রী। তিনি পাঞ্জাবের সনাতন ধর্ম প্রতিনিধি সভার সাথে যুক্ত ছিলেন।

তিনি আর্য সমাজিদের সাথে নানা সময় শাস্ত্রার্থ করেছেন। তার কাছে পরাজিত হয়ে ১৯৩৬ সালে পাঞ্জাবের ফতহগড় চুড়িয়ার বিখ্যাত আর্য সমাজি বিদ্বান ‘মনসারাম’ আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর বিখ্যাত পুস্তক সত্যার্থ প্রকাশককে মঞ্চের মধ্যেই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। লেখক সুরেন্দ্র কুমার শর্মা ১৯৭১ সালে গুরু নানক দেব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে M.A. পাশ করেন। M.A. তে তিনি তার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।এর ফলে গুরু নানক দেব বিশ্ববিদ্যালয় তাকে স্বর্ণ পদক দ্বারা সম্মানিত করে। এরপর তিনি টেক্সাসের মিনেসোটা ইন্সটিটিউট অফ ফিলোসফি থেকে সংস্কৃতে পিএইচডি করেন। এছাড়াও তিনি হিন্দি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন।

বর্তমানে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের একজন অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন।

অনুবাদঃ শুদ্ধবুদ্ধি
প্রচ্ছদঃ জাহিদ হাসান